ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

বিশেষ ফুটবল সংখ্যা ১৯৭৯

মহারণের আগে





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



জেভিয়ার পায়াস / অরুণ মুখার্জি

কলকাতার ফুটবলে উন্মাদনা এখন কি স্তরে পৌঁছেছে, তার বড় প্রমাণ রাষ্ট্রীয় পরিবহন দপ্তরের এক সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপ । বড় দলের খেলা ভাঙার পর হাজার হাজার সমর্থক যানবাহনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন বলে বিজ্ঞাপনে অভিযোগ করা হয়েছে। তারা বলেছেন, খেলা শেষে ঘরমুখো দর্শকদের একাংশের উচ্ছ্বাস কিংবা বিক্ষোভের ঢেউ ময়দান ছাপিয়ে শহরের যানবাহনের তথা রাষ্ট্রীয় পরিবহনের গায়ে প্রতিদিনই আঘাত হানছে। যেমন বাসে অকারণে ইঁট পাটকেল ছোঁড়া, বাসের গায়ে চড়চাপড় মারা, জবরদস্তীভাবে গাড়ীতে উঠে মহিলাদের আসন সহ সমস্ত আসনগুলি দখল করা, টিকিট কাটা নিয়ে কণ্ডাকটর ও ড্রাইভারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা ইত্যাদি ।

অভিযোগ অমূলক নয়, তার আরও প্রমাণ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর ওই ধরনের উগ্র মনোভাবাপন্ন দর্শকদের প্রতি সাবধান-বাণী ।

সম্পাদকীয়তে দর্শক ও উগ্র সমর্থকদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করা সম্ভব নয় মনে রেখে আমরা একটি বিজ্ঞাপন মারফৎ অনুরোধ ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাবধান বাণী লিপিবদ্ধ করলাম এই আশায় যে সবাই সাবধান হবেন ।

রাজ্যের বিভিন্ন ছোটবড় শহর এবং কলকাতা থেকে লেখা বহু চিঠিতে উগ্র দর্শকদের আচরণে ফুটবল খেলাই নষ্ট হয়ে যাবে এরকম আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। আমরাও এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করি না ।

কাজেই মরশুমের 'সেরা' খেলার আগে ও পরে শান্তি বজায় রাখুন এবং উচ্ছ্বাস যাতে শালীনতার সীমা–রেখা অতিক্রম না করে তা প্রতি সবাই লক্ষ্য রাখুন।

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

বর্ষ ৩ ॥ সংখ্যা ৮ ॥
২৯ জুন ও ৬ জুলাই ১৯৭৯



সম্পাদক ঃ অতুল মুখার্জি
শিল্প নির্দেশক ঃ নিতাই ঘোষ
মূল্য : ৩·০০ টাকা
বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা
ভারতের অন্যান্য স্থানে : ২০ পয়সা

যা আছে

বিলি সুসির 'জয় ফুটবল জয়'
চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল জিতবে কে/অতুল মুখার্জি/২
জিতবই— দিলীপ, আত্মবিশ্বাস আছে—প্রশান্ত /৩
মোহনবাগান:ইস্টবেঙ্গল(ভাবনা)/সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়/৬
বড় খেলার দিন আমরা এত টেনশনে ভুগতাম না/অশোক চট্টোপাধ্যায়/১০
খেলার মাঠকে কলুষিত করবেন না/পবিত্র দাস/৪
মহাসমরে রেফারির দায়িত্ব কতখানি/মিলন দত্ত/৪২
বড় ম্যাচে পুলিশ বাহিনী একেবারে নির্ধিরাম সর্দার/অশোক চট্টোপাধ্যায়/৪৩ বুট, বল ও বারপোস্ট/বিপ্লব রায়/৫
সাতই জুলাই চারটের ট্রেন কটায় ছাড়বে/৫
আলির তুলিতে ১৯৭৯ লিগে/১৬
সব খেলার সেরা……বাঙালীর ফুটবল (ভূপেন হাজারিকা, সন্ধ্যা মুখার্জি, মানবেন্দ্র মুখার্জি ও আরতি ভট্টাচার্য)/হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/৫০
মিনি ফুটবলকে ফিরিয়ে আনুন/চুনী গোস্বামী/৭
ভিন্ রাজ্যের সুপার স্টারদের কলকাতায় এ হাল কেন/দিলীপ সরকার/৮
এবার জুনিয়র ফুটবলারদের কে কে নজর কেড়েছে (বিশ্বজিত ভট্টাচার্য ও দিলীপ পাল)/সন্দীপ দত্ত/৬১
এখনকার ফুটবল দেখে নিমু বসু বিরক্ত/চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়/৪৭
মন্ত্রীরাও খেলার মাঠে, কিসের টানে/বিশ্বজিৎ সিংহ/২৬
দল হিসেবে আসাম ছিল সবার সেরা/আর শঙ্করণ/২৯
ফেডারেশন কাপের অর্থ ঘাটতির ধাক্কার পর আগামী বরদলুই নিয়ে ভাবনা/নিজস্ব প্রতিনিধি/৩০
এ উন্মাদনার পরিণতি কি/সুভাষ দত্ত/৩৮
গ্রামের গন্ধ গায়ে মাখা বিদেশ/ছবি ঃ অরুণ মুখার্জি/৩২
কি করে ফুটবলার হওয়া যায়/স্বরাজ ঘোষ/৪৪ উঠছে যারা/৪৮
কেমন খেলছে বড় তিন দল/১০
গত এক বছরে মোহনবাগান এবং এবার/সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়/১৭
গত এক বছরে ইস্টবেঙ্গল/হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/২৪
গত এক বছরে মহমেডান স্পোর্টিং এবং এবারের লক্ষ্য/শিশির ঘোষ/৫৫
কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ মোহনবাগান ক্লাবের একটি দিগন্ত/ ৩৫
নিউজিল্যাণ্ডকে হারানো অসম্ভব ছিল না/সুব্রত সরকার/১৫
বিশ্বক্রিকেটে 'ভারত' নামটি এখন সব থেকে নিচে/সুব্রত সরকার/৪১ ওলিম্পিকের গপ্পো/৫৯
কুস্তিগীর চাঁদগীরামের বিয়ে/ধুন্ধুমার কাণ্ড/মদন পাল ভার্মা/৩৯
পাঠকের কলমে/৩৬ নিতাই ঘোষের ছড়রা/২৮
ছড়া—অলোকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়/১৫, রহিম ইসলাম/৬৩
চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়/ ৪৯, জয়দেব মুখোপাধ্যায়/৫৯
কার্টুন এঁকেছেন ঃ রাজা, আলি ও লাহিড়ী ।
এবারের প্রচ্ছদের ছবি তুলেছেনঃপাহাড়ী রায়চৌধুরী ।
অ্যালবামে তিন প্রধানের খেলোয়াড়রা / ছবি ঃ শংকর নাগ দাস
অন্যান্য ছবি ঃ পাহাড়ী রায়চৌধুরী, শংকর নাগ দাস, অরুণ মুখার্জি, সমর তরফদার, শেখর তরফদার ও অন্যান্য ।





চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল জিতবে কে

অতুল মুখার্জি ঃ ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত মোহনবাগান পিছতে পিছতে একেবারে বাগবাজারে চলে গিয়েছিল। ইস্টবেঙ্গল পর পর ছ'বার লিগ চ্যাম্পিয়ন। মোহনবাগান এর আগের বছর ১৯৬৯ লিগ পায়। ১৯৭১ সালে মহমেডান রানার্স হল। মোহন-বাগানের থার্ড পজিসন। আর ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত ইস্ট-বেঙ্গলের কাছে মোহনবাগানের হারের বহর ছিল ঃ ১৯৭০-এ লিগ ও সুপার লিগের দুটি খেলায় একটি করে গোলে হার। ১৯৭১-এর লিগে ১—১ গোলে ড্র। সুপার লিগ হয়নি। ১৯৭২-এর লিগে হার ২ গোলে। ১৯৭৩-এর লিগে ২—১। সুপার লিগে ১—০। ১৯৭৪-এ মোহনবাগান খেলেনি। ১৯৭৫-এ এক গোলে হার। শুধু ১৯৭৪-এর ডুরাণ্ডের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলকে হারায়। ফাইনাল জেতে ৩—০, উলাগানাথনের হ্যাটট্রিক। পরের বছর ১৯৭৫-এ লিগে হার ও শিল্ড ফাইনালে ৫—০ গোলের বিপর্যয়।

এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ১৯৭৬-এর এক বিকেলে ইডেন গার্ডেনের ক্রিকেট মাঠে সামনা সামনি দাঁড়াল। সারা মাঠ থর থর করে কাঁপছে। এবার কি হবে? তবে আগের বছরের চেয়ে অবস্থা একটু অন্য রকমের। ইস্টবেঙ্গলের চার বছরের কোচ পি কে রাগ করে দল ছেড়েছেন অথবা বরখাস্ত হয়েছেন এই রকম একটা কানাঘুষো ময়দানে চালু হয়েছে। কাগজে কাগজে চিঠি চাপাটি চলেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও পি কে ব্যানার্জির স্ত্রীর সঙ্গে। ইস্টবেঙ্গলের অনেক সদস্য পি কে চলে যাওয়ায় যেমন মনঃক্ষুণ্ণ তেমনি এক ইংরাজী সাপ্তাহিকে পি কে-এর এক ইণ্টারভিউ নিয়ে তোলপাড়। আসলে কি ব্যাপার হয়েছিল সেটা আজও এক রহস্য হয়ে রয়েছে। পি কে-র সঙ্গে হাবিব, আকবর ও সমরেশ চৌধুরী সেবার মোহনবাগানে। ওধারে ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষের মুখে ঘন চিন্তার ছায়া।

তারপর সেই বিকেলে খেলা শুরু হল, আর ৪ সেকেণ্ড অথবা ১৫ সেকেণ্ডের মধ্যে উলাগানাথনের সেণ্টার। আকবরের উদভ্রান্ত হয়ে লাফিয়ে উঠে হেড করা। রেফারির খেলা শুরু হওয়ার হুইশিলের সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলক পড়ার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। তরুণ বসু পরাজিত হল আচমকা গোলে। গোলের আশেপাশে বসে থাকা বেচারি ফটোগ্রাফাররা অথবা টেলিভিশন ক্যামেরা নিয়ে গ্যালারিতে ক্যামেরাম্যানরা সাটার টিপতে পারলেন না পর্যন্ত। কারণ ফোকাশই হয়নি তখনও। পলকে গোল হবে, মোহনবাগান আবার বল পাঠাবে ছ'বারের লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের গোলে! সারা ইডেন হতচকিত। রেডিওতে কান রাখা শ্রোতাদের কানে গোলের খবর ভাল করে যায়নি তখনও।

গোল খেয়ে ইস্টবেঙ্গল কি করেছিল সেটা সবাই জানেন। আর জানেন মোহনবাগান ওই ম্যাচ কিভাবে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পেরেছিল। গোলেই যখন হারজিত হয়, রেফারির বাঁশী যখন সেই গোলে সায় দেয় তখন সংবাদপত্রের শিরোনামা হাজার চেষ্টা করেও তা বদলাতে পারে না। মোহনবাগান জিতেছিল এবং ভাল খেলেই জিতেছিল। এটা মেনে নেওয়া উচিত সকলেরই। যেমন পাঁচ গোল খাওয়ার রেকর্ড বদলান যাবে না কোনদিন।

গোল কেমন করে হয়েছিল আকবরকে এক সাংবাদিক আড়ালে জিজ্ঞেস করায় জবাব এসেছিল 'আল্লানে গোল দিয়া'। আকবর হলপ করে বলতে পারে না আবার ওই রকম গোল করতে পারবে কিনা। তবে উলাগার পা থেকে গোল লাইনের ঠিক ওপর থেকে ছিটকে আসা বলে তার চোখ ছিল, সেটা এখনও সে দাবি করে। পেনাল্টি বক্সের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে লাফ মেরেছিল এটাও মনে আছে তার।

এরপর শিল্ড ফাইনালে সমান সমান ফল। রোভার্স পেল মোহনবাগান। কিন্তু ১৯৭৭-এর সেই বিকেলে আবার এক বিপর্যয়, আর নিজের মাঠেই। সাত মিনিটে মিহির বসুর পা থেকে একটা আগুনের গোলা বেরিয়ে গিয়ে বিশ্বজিত দাসকে শুইয়ে দিল, এবং মোহনবাগান গোল খেল। চার মিনিট পরে ইস্টবেঙ্গলে ফিরে যাওয়া সমরেশ চৌধুরী নেকড়ের চোখ নিয়ে মোহবাগানের গোল খান খান করলে বিশ্বজিতের কপাল পুড়ে গেল সেই সঙ্গে। বিশ্বজিত আর উঠতে পারেনি তারপর। দুটি গোল মানে মোহনবাগান লিগ হারালো সঙ্গে সঙ্গে। হুলস্থুল পড়ে গেল কোচ আর খেলোয়াড়দের নিয়ে। কারণ সমরেশ চলে যাওয়ার পর মোহনবাগান দলে এসেছে গৌতম, সুধীর কর্মকার, সুভাষ ভৌমিক ও শ্যাম থাপা। হাবিব ও আকবর ছিলই। হারার মধ্যে অনেকেই ভূত দেখলেন, কেউ বাঁকা চোখে তাকালেন তারা ঠিক ঠিক খেলেছে কিনা তাদের পুরনো ক্লাবের বিপক্ষে। ওধারে তারুণ্যের জয় নিয়ে ফাটাফাটি চলেছে কাগজে কাগজে। মোহনবাগানের 'বুড়োদের' নিয়ে বুড়োরা পর্যন্ত মাথা দোলালেন আড়ালে। কিন্তু 'বুড়োরা' জবাব দিলেন শিল্ডে। তারপর দিল্লির ডুরাণ্ডে, বোম্বাই-এর রোভার্সে। ট্রিপল'ক্রাউন। 'বুড়োরা' সব ছোকরা হল আবার।


কার্টুন : আলি

এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের কোচের মাথা ঘাড় থেকে নেমে গেল, অর্থাৎ তিনি বরখাস্ত হলেন। লিগের খেলায় মোহনবাগানের শ্যাম থাপা ট্রাই সাইকেল না বাই সাইকেল ভলি মেরে ভাস্করকে হার মানালেন। আটাত্তরের শুরুতেই ইস্টবেঙ্গলের জ্ঞাতি শত্রু মোহনবাগান ঘেঁষা উয়াড়ি (একসময় ঢাকার) দাগা দিয়েছিল। ময়দান সেদিন উত্তাল হয়েছিল ওই বিপর্যয়ে। তারপর পোর্ট ট্রাস্টের কাছে এক পয়েণ্ট হারানো। ক্লাবের মধ্যে কর্তাব্যক্তিদের টালমাটাল অবস্থা। শিল্ডে ইস্টবেঙ্গল হারল সেমিফাইনালে সোভিয়েত ইউ-নিয়নের আরারাতের কাছে। কর্তাদের অবস্থা সঙ্গীন বললে কম বলা হয়। ওধারে ফাইনালে মোহনবাগান এক গোলে পিছিয়ে থেকে দারুণ খেলল, গোল শোধ হল। তারপর এক গোলে এগিয়ে গেল। কিন্তু ম্যাচ ধরে রাখতে পারল না। আরারাত শেষমেষ গোল শোধ করে দিল। শিল্ডে দুটি দল যুগ্ম-বিজয়ী। মোহনবাগানের ডগমগ অবস্থা।

কিন্তু বছর ঘুরতে জ্যোতিষীর কথা ফলে গেল। কোচ অরুণ ঘোষের সাফল্য আসবে, তবে দেরীতে। ডুরাণ্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল টানা তিন গোলে হারাল মোহনবাগানকে। সুব্রত ভট্টাচার্য ও দিলীপ পালিত দলে ছিলেন না, যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মোহন-বাগানে ইস্টবেঙ্গলের ১৯৭৫ এর পাঁচজন (শ্যাম, হাবিব, আকবর, গৌতম ও সুধীর) ছিল না একথাও মানতে হয়। রেকর্ড ওসব মানে না। ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮-এর বছরের গোড়ায় যা হয়েছে তাও রেকর্ড বুকেই থাকবে।

বোম্বাই, কোজিকোড় ও বাঙ্গালোর মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে ধরাশায়ী করে বাড়ি পাঠাল। এর আগে থেকেই বলতে গেলে আটাত্তরের শুরুতেই ইস্টবেঙ্গলের পাঞ্জাবী, কেরলীয় ও নাইজিরিয়ার সব তারকাদের সন্ধান। মোহনবাগান থেকে সুভাষ ভৌমিক ইস্ট-বেঙ্গলে ফিরে গিয়েছে। হরজিন্দার, মনজিত, গুরদেব, দেবরাজ, ডেভিড উইলিয়ামসরা গায়ে চড়িয়েছেন লাল হলুদ জার্সি। মোহনবাগান কেরলীয় পায়াসকে মাত্র পেয়েছে। বাকী ইস্টবেঙ্গলের তপন দাস, রঞ্জিত মুখার্জি। হারিয়েছে হাবিব, আকবরকে মহমেডানের কাছে। আর ইস্টবেঙ্গল থেকে ছিটকে চলে গিয়েছে সমরেশ চৌধুরী। হাবিব, আকবর, সমরেশ মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলে নেই এবার, ভাবা যায় না।

তবে কলকাতার লিগ কলকাতারই নিজের জিনিস। লিগের খেলা ঝড় তোলে সারা বাংলায়, আসামে, ত্রিপুরায়। যারা আরও দূরে থাকেন তারাও মাঝে মাঝে উত্তেজিত হন। কে কবার লিগ পেয়েছে চুলচেরা বিচার হয়। মোহনবাগান এক বছর এগিয়ে আছে লিগে। কিন্তু কে কটা ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ম্যাচে গোল করেছে তার হিসেব কেউ রাখতে চায় না। যে সত্তর দশকে হাবিব তিনবার গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে জিতিয়েছে সে এবার নেই। মোহনবাগানেও নয়। যেমন নেই আকবর। নেই সমরেশ। কিন্তু যারা আছে তারা হল শ্যাম থাপা ও সুভাষ ভৌমিক। ১৯৭৫ ও ১৯৭৮-এ শ্যাম গোল করেছে। কার বিপক্ষে লিখলাম না। ১৯৭৩-এ সুভাষ ভৌমিক লিগ ও সুপার লিগে স্কোরার। কার পক্ষে বলা প্রয়োজন নেই। সুভাষ ও শ্যামকে ভাবতে হবে আরও একটি করে গোল করতে পারলে মোহনবাগানের নিমু বসু, চুনী গোস্বামী, রুনু গুহঠাকুরতা ও ইস্টবেঙ্গলের আমেদ খান, হাবিবের তিন গোলের রেকর্ড ছু'তে পারবেন। সমর ব্যানার্জি (বদ্রু) মোহনবাগানের পক্ষে চারটি গোল করেছেন লিগের খেলায়। ভেঙ্কটেশ ও অসীম মৌলিকরা দু'দলের পক্ষে এবং বিপক্ষে গোল পেয়েছেন তিনটি করে। কাজেই পাঁচটি গোল করার রেকর্ড এখনও মোহনবাগানের সতু চৌধুরীর।

আটাত্তরের শুরুতে আমাদের জ্যোতিষী অরুণকুমার ভবিষ্যৎবাণী যা করেছিলেন আকারে ইঙ্গিতে তা মোটামুটি ফলে গিয়েছে। যেমন ভাস্কর বার বার গোল খাবে বাঁ দিক দিয়ে। কিছু ইঙ্গিত আমরা প্রকাশ করিনি খেলার কথা মনে রেখে। এবার যা বলেছেন তার মর্মার্থ হল ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান টায়ে-টুয়ে। ভয় নেই। পাঠকবর্গ মানে খুঁজে নিন। আমরা বুঝতে পারিনি বলে দুঃখিত।

জিতবই —দিলীপ

'ফল কি হবে সাত তারিখের খেলায় ?' প্রশ্নটা শুনেই মোহনবাগান অধিনায়ক দিলীপ পালিত হেসে ফেললেন। 'তা কি কেউ বলতে পারে।'

'তবুও এতগুলো ম্যাচ হল, দু'দলের শক্তির বিচারে সম্ভাবনা কাদের বেশী।'

'দেখুন এটা সবাই জানে শক্তির বিচার করে দু'দলের হার-জিত আন্দাজ করলে তা ভুল প্রমাণিত হতে পারে। মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গল খেলাটা খেলার শক্তির উপর নয়, নির্ভর করে মানসিক বলের উপর। মানসিক বলে যে বিপক্ষকে দাবাতে পারবে, খেলায় জয় তারই হবে। তবে একথা বলতে পারি এই মুহূর্তে দল মানসিক দিক থেকে বেশ সতেজ আছে। এই মানসিক অবস্থা বজায় থাকলে আমরা নিশ্চয়ই জিতব।'

'দেখুন আমার কয়েকটা ম্যাচে না খেলা ও মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে যে প্রশ্ন করেছেন তা নিয়ে কোন মন্তব্য করব না। এই মুহূর্তে তা করা উচিতও নয়। কর্মকর্তারা যদি আমাকে খেলান তবে নিশ্চয়ই ভাল খেলবার চেষ্টা করব এর বেশী কিছু বলতে চাই না।'

'আপনি বলছেন কর্মকর্তারা যদি খেলান, কোচ—'

'কোচ প্রদীপদা থাকছেন না, যতদূর জানি উনি ২৮/২৯ তারিখেই মাদ্রিদ যাচ্ছেন স্কুল টিম নিয়ে।'



বড় টেনশনে ভুগি

'দেখুন কি বলব বুঝতে পারছি না। স্বামী যে টিমের ক্যাপ্টেন সে টিম জিতুক তাই তো চাই। খেলার দিন ওর এবং টিমের মঙ্গল কামনায় দক্ষিণেশ্বরে মায়েরবাড়ি পুজো দেব। খেলার কথা ভাবলে এখন থেকে টেনশনে ভুগি। খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না।' মোহনবাগান অধিনায়ক দিলীপ পালিতের স্ত্রী নন্দিতা বেশ সিরিয়সলি কথাগুলো বললেন। প্রসঙ্গত বললেন—'জানেন তো গত কয়েকটা খেলায় ওকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, জানি না ৭ তারিখে ওকে খেলাবে কিনা, তবে খেলালে ও ভালই খেলবে বড় খেলায়, এ বিশ্বাস আমার আছে। মোহনবাগান জিতবে এটাই আশাকরি। তবে জিতবেই—এমন কথা কি বলা যায়—বলুন ?'

'খেলা দেখতে যাবেন কি ?' এই প্রশ্নের উত্তরে নন্দিতা শিউরে উঠে বললেন—'মাথা খারাপ! ওর মধ্যে খেলা দেখা যায় ? টিভিতে দেখব'।



'আমি তো ভগবান নই বাপু'

মোহনবাগানের মালী গোকুল মহারণ নিয়ে তেমন কিছু বলতে নারাজ। 'এ খেলার ফল কি হবে তা ভগবান বলতে পারেন, আমি তো ভগবান নই বাপু। কি করে বলি কে জিতবে ?' 'তবুও, মন কি বলে ?' এ প্রশ্নের উত্তর গোকুল আর দেয়নি। বড় ব্যস্ত ছিল সে।

আমি আশাবাদী। তবে দর্শক সমর্থকদের মনে বিরাট প্রত্যাশা জাগাবার পক্ষপাতী আমি নই। সব কিছুর জন্য আমাদের যেমন, তেমনি দর্শক ও সমর্থকদের মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অধিনায়ক হিসাবে আমার সিনিয়র ও অন্যান্য খেলোয়াড় সকলের পক্ষ থেকে আমাদের প্রিয় দর্শকদের কাছে অনুরোধ তারা যেন হঠাৎ উত্তেজনার বশে এমন কিছু ঘটনার হোতা না হন যাতে এই ঐতিহ্যময় টিমের নামে বিন্দুমাত্র কলঙ্কর ছায়া পড়ে। আমার এই নিবেদনকে তারা যেন খেলার আগেই হেরে যাবার মনোবৃত্তি বলে ভুল না করেন।'

এই আবেদন জানিয়েছেন মোহনবাগানের অধিনায়ক দিলীপ পালিতও। তার বক্তব্য 'হার-জিত যে কোন খেলায় অপরিহার্য। হারলে কি আমাদের খারাপ লাগবে না ? আমরা আমাদের সব সামর্থ্য উজাড় করে দেব। জিতবই এই মনোভাব নিয়ে মাঠে নামব। কিন্তু কোন অঘটন ঘটলে দর্শকরা যেন তা খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করেন।'



আত্মবিশ্বাস আছে —প্রশান্ত

বড় খেলায় পি কে থাকছেন না, এটা নিশ্চয়ই মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে কিছুটা অসুবিধার ব্যাপার। গত বছরে বড় খেলায় ইস্টবেঙ্গল-কোচ অরুণ ঘোষ ছিলেন না। এবার কিন্তু তিনি থাকছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়দের এটা অবশ্যই বাড়তি মনোবল জোগাবে।

ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক প্রশান্ত ব্যানার্জি স্পষ্ট করে বললেন—খেলার ফল কি হবে তা বলা যাবে না। কারণ এ খেলার ফল কোনরকম ছক বেঁধে এগোবে না। খেলতে নেমেই যারা বিপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে সফল হবে আশা করা যায় তারাই জিতবে। তবে এবার আমরা খুশী, অরুণদা থাকছেন।'

'টিম কি বেশ গুছিয়ে খেলতে পারছে বলে মনে হয়।'

'সেটা আমি কি বলব বলুন। আপনারা তো খেলা দেখছেন। তবে একথা জোর দিয়ে বলা যায় এখন অবস্থা অনেক ভাল আত্মবিশ্বাস আছে। জয় পাবার জন্য আমরা আমাদের সাধ্যমত করব।

ছেলেরা লড়বে জান দিয়ে

'কি বলব বলুন—জানেনই তো ইস্টবেঙ্গল—মোহনবাগান খেলা টেনশনের খেলা, নার্ভের খেলা। যে দল নার্ভ শক্ত রেখে খেলতে পারবে তারাই জিতবে।' ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অভিভাবক শঙ্কর মালি কিছুটা উদাস কণ্ঠে কথাগুলো বলল ক্লাব তাঁবুর লনে বিছান বেঞ্চটিতে বসে। শঙ্কর মালির মতে, 'টিম এখনও তেমনভাবে সেট করেনি, তবে ছেলেরা লড়িয়ে, লড়ে যাবে জান দিয়ে এটুকু বলতে পারি।

নার্ভের খেলা—দেখুন না কি হয়।'

সকলে যেন অক্ষত দেহে বাড়ি ফিরতে পারে

'নিজের ছেলের টিম জিতবে এতো সব মা'ই চায়। আমিও চাই ইস্টবেঙ্গল জিতুক, আমার ছেলে জয়ী হয়ে ফিরুক'। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অধিনায়ক প্রশান্ত ব্যানার্জির গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে একটু স্নেহমাখা হাসি হাসলেন ওর মা।

'আপনার কি মনে হয় আপনার ছেলের টিম অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল এবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে জিতবেই ?'

'কেন নয় ? মোহনবাগান তো এমন আহামরি খেলছে না। ঠাকুরের কৃপায়, গুরুদেবের আশীর্বাদে আমার প্রশান্তর টিম জিতবে। ও নিয়ে আমি খুব ভাবি না, প্রশান্ত বড় ভক্তিমান ছেলে। আমার গুরুদেব খেলাধূলা পছন্দ করতেন তার আশীর্বাদ যদি ও পায় নিশ্চয়ই ইস্টবেঙ্গল জিতবে। কিন্তু বড় ভয় হয় মাঠের আজকাল যা অবস্থা, কোনদিন অঘটন না ঘটে, ঘরে বসে রেডিও শুনি, একটা গোল হলে নিশ্চিন্ত মনে হয়।'

প্রশ্ন করলে জানালেন তিনি খুব একটা টেনশনে ভোগেন না, বাড়ির প্রায় সকলে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক তিনি সুরজিতের ওপর প্রচণ্ড আশা পোষণ করেন। 'মিহির বসু চেষ্টা করছে খুব; কিন্তু কেন যেন খেলতে পারছে না ছেলে। মোহনবাগানের গৌতম বেশ সুন্দর খেলছে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কার খেলার ফল যাই হোক দু'দলের ছেলেরা ও দর্শকরা সকলে যেন অক্ষত দেহে সুস্থ শরীরে মায়ের কোলে ফিরে যেতে পারে।' (সাক্ষাৎকার : পবিত্র দাস)

দিলীপ পালিত ও সুব্রত ভট্টাচার্য / অরুণ



'খেলার মাঠকে কলুষিত করবেন না

এ মরশুমে এ পর্যন্ত একাধিক ঘটনা ঘটে গেছে। ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে কয়েকজন আক্রান্ত হয়েছে ক্ষুরে। সদস্য গ্যালারিতে ওই কাণ্ড ভাবাই যায় না। ছোটোখাটো ঘটনা নিয়ে আরও কত কাণ্ড ঘটল। এর জন্য কারা দায়ী, কেন ?—সে সব নিয়ে তর্কাতর্কির অবকাশ নেই। খেলার মাঠে অশান্তি কেউই চান না। কিন্তু অশান্তি বাড়ছে—তা নিয়ে চিন্তা অনেকের। ক'দিন আগে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও মাঠে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান। আবেদন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দেরও—'মাঠে শান্তি চাই'।

পবিত্র দাস ঃ কলকাতা ফুটবলের নতুন এক রোগ—মাঠে অশান্তি। তিন প্রধানের খেলা থাকলেই শঙ্কা হয়। মাঠের মধ্যে গ্যালারিতে নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় মানুষের ভাবনা—কখন কি হয়। এই বুঝি মাঠে ঢিল পড়া শুরু হল, এই বুঝি পুলিস লাঠি হাতে ধেয়ে এল গ্যালারির দিকে। মাঠের বাইরে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রের মানুষরা কামনা করে বড় দল যেন জেতে, যদি না জেতে তাহলে মাঠের অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে রাজপথে। ট্রাম, বাস আক্রান্ত হবে, প্রাইভেট গাড়ির কাঁচ ভাঙবে, গাড়ির চাকায় ভরা হাওয়া বেরিয়ে এসে মিলিয়ে যাবে অন্তহীন বাতাসের সঙ্গে। ট্রামে-বাসের যাত্রীরা সিঁটিয়ে থাকবে, সমর্থকদের ঢিলের আঘাতে আহত হয়ে বাড়ি ফিরবে। রাস্তা একসময় ট্রাম-বাস শূন্য হয়ে যাবে, পুলিস রাস্তায় নেমে যা করবার করবে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে তাণ্ডব শুরু হয়ে যাবে।

এ নিয়েই ক'দিন আগে কথা হল দুই প্রধান মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে। সিনিয়র খেলোয়াড়। কলকাতা মাঠের অনেক কিছু তারা দেখেছেন। মাঠকে ভালবাসেন, সমর্থকদের নিয়ে গর্ববোধ করেন।

মোহনবাগান তাঁবুতে মাঝখানে বিছান বিরাট টেবিলটার একপাশে চারখানা চেয়ারে বসে গৌতম সরকার, প্রসূন ব্যানার্জি, দিলীপ পালিত ও সুব্রত ভট্টাচার্য। গৌতম স্বল্পভাষী, সিরিয়স। এবছরের মাঠে যেসব ঘটনা ঘটছে তা নিয়ে বেশ বিচলিত মনে হল ওকে—'আমি তো ভাবতে পারি না, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল বা মহমেডান কোন খেলায় পয়েন্ট হারালে, গোল না দিতে পারলে অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটবে কেন ? কেন কমজোরী, কম নামী দল ভাল খেললে তাদের প্রশংসা না করে খেলোয়াড়দের ঢিল মারা হবে, কেন হার-জিতকে খেলার অঙ্গ বলে বড় দলের সমর্থকরা ভাবতে পারবে না। তথাকথিত ছোট দলে যারা খেলে তারা কি ভাল খেলোয়াড় নয় ? দু'এক বছর পরে তো তারাই মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলে বা মহমেডানে খেলবে—তবে কেন মাঠে নোংরামি হবে ? আসলে কি জানেন খেলার মধ্যে যে পবিত্রতা তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—আমরা ভুলে যাচ্ছি খেলাটা অন্য জিনিস, এর রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও একটা সৌন্দর্য থাকে।'

প্রসূন বললেন—'এই তো খবরের কাগজে দেখলাম ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে কে বা কারা ব্লেড না কি দিয়ে পাশে দাঁড়ান দর্শকদের গা চিরে দিয়েছে। আপনি বলুন, এটা কি নোংরামি। এরা কি সত্যিই খেলা পাগল দর্শক না স্রেফ পাগল। আবার দেখুন আমরা তো মেসিন নই। মাঠে নেমে যেদিন ভাল খেলতে না পারি সেদিন ওই হার-জিত নিয়ে তাণ্ডব হবে কেন ? আমার বিশ্বাস এরা ক্রীড়াপ্রেমী নয়, এদের কাজটাই হচ্ছে ওই। খেলার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক যারা খেলাকে ভালবাসে তারা একাজ করতে পারে না। আর একটা জিনিস দেখে বড় দুঃখ হয়। মোহনবাগানের কোন খেলোয়াড় ইস্টবেঙ্গল মাঠে গেলে তাকে কটূক্তি শুনতে হয়, মোহনবাগান মাঠে এসে কোন ইস্টবেঙ্গল প্লেয়ার খেলা দেখতে পারবে না খোলা মনে এ কেমন কথা ?'

'না আমি এবছর একটা খেলা দেখতে গিয়েছিলাম, অরুণদার পাশে বসে খেলা দেখেছি—আমার সঙ্গে কিন্তু কেউ খারাপ ব্যবহার করেনি। তবে একথাও ঠিক তেমন ঘটনা যে বিরল তা নয়, গৌতম যা বলেছে তা মিথ্যা নয়।' সুব্রত ভট্টাচার্য আলোচনার সূত্র ধরে বলেন—'ছোটবেলায় আমিও টিকিট কেটে লাইন দিয়ে খেলা দেখছি—মনেপ্রাণে প্রিয় দলকে সমর্থন করতাম, কিন্তু এখন ক্রমশ যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে সব, খেলা আর খেলা থাকছে না।' শক্ত মানুষ সুব্রতর দুঃখ—'আমাদের দুঃখ কাউকে বোঝাবার নয়। কিন্তু দর্শকদের কাছে আমাদের কোন ক্ষমা নেই, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলি আপনাদের দুঃখ, ক্ষোভ সব কিছুর কারণ বুঝি, যে কষ্ট করে কলকাতার দর্শক খেলা দেখেন তা এক কথায় অমানুষিক। ভাবা যায় না দর্শকদের জন্য সামান্য জলের ব্যবস্থাও এতদিনে হল না। কিন্তু তবুও বলি আপনারা যদি একটু ধৈর্য ধরেন, আমাদের কথা সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করেন তবে আমরা ভাল খেলব, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অনুরোধ ঃ হারা-জেতাকে বড় করে না দেখে আপনারা ভাল খেলায় উৎসাহ দিন দেখবেন কলকাতার নেমে যাওয়া ফুটবল মান আবার উঠে আসবে। ছোট দলের ভাল খেলাকে প্রশংসা না করতে পারলে সেটা আমাদেরই লজ্জা, টিমের সুনামের পরিপন্থী।'

টিম ভাল না খেললেই কেবল দর্শকরা উত্তেজিত হন, তা মানতে গৌতম রাজি নয়। তার মতে 'প্রিয় টিম গোল না করলে, না জিততে পারলে মাঠে উত্তেজনা আসা স্বাভাবিক কিন্তু খেলা শেষে রাস্তায় রাস্তায় যা হয়।' ——

দেখুন ফুটবল আমাকে অনেক দিয়েছে, আমার যা কিছু সামর্থ্য আমি ফুটবলকে দিয়েছি। পরিবর্তে ভালবাসা পেয়েছি। ফুটবলের প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে, একজন সাধারণ বাংলার ফুটবলার হিসাবে দর্শকদের কাছে আবেদন আপনারা অশান্তির ইন্ধন জোগাবেন না, এতে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের প্রিয়, আপনাদের বড় ভালবাসার বাংলার ফুটবল শেষ হয়ে যাবে। আমরা হয়ত বেশী দিন খেলব না, কিন্তু যারা আসছে তাদের খোলা মনে খেলতে দিয়ে বাংলার ফুটবলকে উন্নত করুন। ছোট দলের ছেলেরা ভাল খেললে সেটা তো বাংলার ফুটবলের আশা। যদি তাদের খেলতে না দেন তবে বাংলার ফুটবল আরও নেমে যাবে।'

অধিনায়ক দিলীপ এদের কথাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন, চিন্তিত তিনিও। তার বক্তব্য—'খেলার মাঠে অশান্তির নানা কারণ আছে, অযৌক্তিক কোনটাই নয়, দর্শকদের উত্তেজনা অস্বাভাবিক কিছুকে কেন্দ্র করে তাও বলছি না। তবু বলি প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির আশা করা অন্যায় নয়। আমরা যেটুকু খেলেছি তাতে বিন্দুমাত্র যদি দর্শকদের আনন্দ দিতে পারি তবে সেই অধিকারে আমরা দর্শকদের কাছে অনুরোধ করব আপনারা এমন কিছু কখনই করবেন না যাতে আপনাদের কাজকে খেলোয়াড় সুলভ নয় বলে কেউ আখ্যা দিতে পারে।

❂

ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে যেদিন সকালে গেলাম সেদিন সুভাষ ভৌমিক, শ্যামল ঘোষ ওরা আলোচনা করছিলেন তার আগের দিনের একটি দুঃখজনক ঘটনার। সুভাষ ক্ষোভের সঙ্গে বললেন—'ভাবতে পারেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সদস্য গ্যালারি থেকে এমন একজনকে পাওয়া গেল যার কোমরে গোঁজা ইয়া বড় এক ক্ষুর, তার আগের খেলায় তো বেশ কয়েকজন ক্ষুরের ঘায়ে জখমও হয়েছে। লোকটাকে পুলিশ যখন মারতে মারতে নিয়ে গেল তখন ভাবছিলাম এ লজ্জা কার? ক্লাবের, খেলোয়াড়দের, সদস্যদের, কার ? আমার একটা কথা আজও বেশ মনে আছে আমি তখন মোহনবাগানে। সদস্য আসনে, যেখানে সম্ভ্রান্তরা সব বসেন, সেখান থেকে ছোট্ট একটা গালাগালির শব্দ ভেসে এল, বলাই দা তক্ষুনি উঠে গিয়ে যে লোকটি গালাগালি দিয়েছিল তার কাছ থেকে কার্ড কেড়ে নিয়ে বললেন—'এমন সদস্য মোহনবাগান টিমের দরকার নেই বেরিয়ে যাও মাঠ থেকে।' আর আজ ছোট কেন অনেক চোস্ত গালাগালিও সমস্ত বাতাসে ভেসে বেড়ায়, কিন্তু ক্ষুর কেন ? তা কি আমরা, যারা খেলতে পারব না তাদের গলা কাটার জন্য ? ভাবতে কষ্ট হয় সমর্থক ও খেলোয়াড়দের সম্পর্ক কি এমন পর্যায়ে নেমে গেছে ? তাহলে খেলা কার জন্য, কিসের জন্য ? আমি কলকাতার মাঠে এগার বছর খেলছি, অনেক পেয়েছি আর কিছু সম্ভবত আমার জন্য অপেক্ষা করে নেই—কিন্তু ভাবতে কেমন লাগে যদি এক বিরাট ক্ষত নিয়ে আমাকে মাঠ ছাড়তে হয় ?'

শ্যামল ঘোষ মাঠের অশান্তি নিয়ে ভেবেছেন অনেক, কিন্তু কেন যে এমন হল তা বোধগম্য নয় তারও—'এমন একটা উগ্র ব্যাপার দেখা দিল '৭৬ থেকে। যারা ক্ষুর নিয়ে মাঠে আসে তারা আদৌ দর্শক নয়। যারা বিপক্ষ দল ভাল খেললে খেলোয়াড়কে ঢিল মারে তারা ক্লাবের শুভাকাঙ্ক্ষী—ভাবতে কষ্ট হয়। তবে আমার মনে হয় এসব ব্যাপার থামাতে পারে দর্শকরাই, সামান্য কয়েকজন যারা করে তাদের বাধা দিলে তারা এগোতে সাহস পাবে না। আমাদের অনুরোধের সামান্য মূল্যও যদি থাকে তবে বলি,



ইস্টবেঙ্গল টেন্টে আলোচনারত শ্যামল ঘোষ, প্রশান্ত ব্যানার্জি, সুরজিত সেনগুপ্ত ও তরুণ বসু / অরুণ

কলকাতার ফুটবল মর্যাদাকে বাড়াবার সমস্ত দায়িত্ব এখন দর্শকদেরই কারণ পুলিশ দিয়ে এসব হবার নয়—আপনারা ফুটবলপ্রেমীরা এগিয়ে আসুন দেখবেন এতবড় সমস্যা আর সমস্যা থাকবে না।

সুরজিত সেনগুপ্ত ও তরুণ বসু পরদিন ওই একই বিষয় নিয়ে শ্যামল ঘোষ ও অধিনায়ক প্রশান্ত ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলছিলেন, ওরা সকলেই চিন্তা করছে ; সকলেই ভাবছে মুক্তির উপায় কি ? কিন্তু সুরজিত ও তরুণের এক কথা—'আমাদের নামে দর্শকদের কাছে কিছু আবেদন রাখবেন না। যা আলোচনা করলাম তা আমাদেরই একান্ত আলোচনা। তাছাড়া দর্শকরা আমাদের আবেদনের যদি মূল্যই না দিল তবে কি প্রয়োজন অনর্থক আবেদন জানিয়ে ? আমরা কেবল কামনা করতে পারি দর্শকদের শুভবুদ্ধি হোক।'

অধিনায়ক প্রশান্ত ব্যানার্জি. সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছেন অনেক, কিন্তু কিছুই না. করতে পারার জন্য ছটফট করছেন। 'কি বলব বলুন ? আমরা হয়ত বা দর্শকদের কোন অনুরোধ করার যোগ্য নই। কিন্তু ভাবতে খুব খারাপ লাগছে এবছরই লিগের শুরুতেই দুটো ঘটনা ঘটল, বিশ্রী ব্যাপার। এভাবে ক্লাবের সম্মান নষ্ট করার অধিকার ওদের আছে কিনা জানি না, তবে আমি অনুরোধ করব আমরা কেবল পারি খেলা দিয়ে ক্লাবের ঐতিহ্য গড়তে, কিন্তু অন্য ঐতিহ্য, সুনাম সবই তো দর্শক, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের। দোহাই এটা আপনারা নষ্ট হতে দেবেন না। কোন ব্যক্তি বা কোন বড় প্লেয়ারের থেকেও অনেক বড় আমাদের এই ক্লাব।'

বুট, বল ও বারপোস্ট

বিপ্লব রায় ঃ খেলা আর খেলোয়াড়দের নিয়ে পাগল সবাই, কিন্তু ফুটবলের সাজসরঞ্জাম ? তার হাল-হকিকৎ নিয়ে মাথা ঘামায় ক'জন। অথচ এই ব্যাপারটাও কিছু কম 'ইন্টারেস্টিং' নয়।

গোলপোস্টের কথা দিয়ে শুরু করা যাক। কলকাতায় তিন ঘেরা মাঠের গোলপোস্টই



সেগুন কাঠের তৈরি। ২৫ ফুট লম্বা বার আর আট ফুট লম্বা পোস্টের ওপর যে ধকল যায় সারা সিজন ধরে, তাতে ভাল কাঠ না হলে বিপদ অনেক। ময়দানের অন্য সব মাঠেও অগুন্তি গোলপোস্ট দাঁড়িয়ে আছে। ভালয় মন্দয় মেশানো কাঠের তৈরি। মাঝেমধ্যে ভেঙে পড়ে দু'একটি। তৈরি যে বাজে কাঠের বুঝতে বাকি থাকে না তখন।

পোস্ট অথবা বার আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী চার ইঞ্চি চওড়া থাকার কথা। তবে মোহনবাগানের পরিকল্পনা আছে কাঠ নয়, লোহার বারপোস্ট লাগানোর। বিদেশে এখন এই বারপোস্টই লাগানো হয়। ধরনটা চৌকো নয়, গোল। বারে বা পোস্টে লাগলেও তাতে বল গোলে না গিয়ে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা কম। দরকার শুধু আন্তর্জাতিক মানের স্পেশিফিকেশনের। আই এফ এ'কে এজন্য চিঠিও লিখেছে তারা।

গোলপোস্ট কিন্তু পাল্টানো হয় না বছর বছর। মোহনবাগান মাঠের একটা গোলপোস্ট ক্যালকাটা ক্লাবের আমলের। অধিকাংশ গোলপোস্টই রং করিয়ে নেওয়া হয় মরশুমের শুরুতে। পোস্টের যে অংশটুকু থাকে মাটির নিচে তাতে আলকাতরা বা অন্য কিছু লাগিয়ে দেওয়া হয়। যাতে মাসের পর মাস মাটিতে পোঁতা থাকলেও কাঠ পচে যেতে না পারে।

কলকাতায় শুধু মোহনবাগান মাঠেই গোলের জাল নাইলনের। বাকি সব মোটা সুতোর জাল। নাইলন জালের মজা হল প্রথমবারই যা খরচ বেশী। ছেঁড়া-খোঁড়ার ভয় না থাকায় অনেক দিন চলে। বারবার খরচের সম্ভাবনাও নেই।

যে ধরনের বুট পরে খেলোয়াড়রা মাঠে নামে তা অধিকাংশই একই ধরনের। প্রকার-ভেদ বড় একটা নেই। গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি বুটের স্টাডও চামড়ার। তবে শুকনো মাঠে ছোট স্টাডের বুট ব্যবহার করা হলেও এসব বুট সাধারণত নরম হয়। বর্ষার মাঠে স্টাড চাই বড়, বুটও কিছুটা শক্ত হয়।

বাইরের অনেক দেশে ফুটবলারদের কিন্তু এ সমস্যা নেই। তারা যে ধরনের বুট ব্যবহার করে তার স্টাড দরকারে কমানো বাড়ানো যায়। খেলাধূলার সরঞ্জাম তৈরিতে জগৎ জোড়া নাম 'অ্যাডিডাস'এর। তাদের বুট এদেশে আসে কম। কলকাতায় অবশ্য বেশ কয়েকজন ফুটবলারের 'অ্যাডিডাস' বুট আছে।

কলকাতায় যারা ফুটবল খেলে তাদের বুট কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তৈরি হয় না। ফুটবলাররা নিজেদের পছন্দমত লোককে দিয়ে বুট করিয়ে নেয়। চৌরঙ্গীর দু-একটি নামী দোকানও অনেকের পছন্দ। তবে ময়দান মার্কেটের সামির অথবা গোবিনের তৈরি বুটের ভালই কদর আছে খেলোয়াড় মহলে।

বহু পরিচিত সেই 'টি' শেপের বলের যুগ আর নেই। এখন গোল করে একই মাপের কাটা চামড়া সেলাই করে বল তৈরি হচ্ছে স্বভাবতই লেস বাঁধা কি হেড করতে গেলে লেস এর উঁচু হয়ে থাকা জায়গাটুকু মাথায় লাগা কিছুরই ঝঞ্ঝাট নেই। ভাল্ব সিস্টেমের বল ব্যবহারও সুবিধের।

তবে যে মানের বল এদেশে তৈরি হয় তা যে নিখুঁত একথা বলার উপায় নেই। জলে পড়লে অধিকাংশ বলই ফুলে যায়। ডায়ামেটার মাপলে বল তখন ইঞ্চি কয়েক বড়। 'অ্যাডিডাস' বল কিন্তু জলে পড়লেও সহজে তার আকৃতির পরিবর্তন হয় না। একেবারেই যে হয় না এমনও নয়। তবে তা অনেকবার জলে পড়ার পর।

সাতই জুলাই চারটের ট্রেন কটায় ছাড়বে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ মোহনবাগান-স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলা শেষে ফিরে আসছি। এক ফেরিওয়ালার জিজ্ঞাসা ঃ বলুন তো, সাতই জুলাই চারটের ট্রেন ক'টায় ছাড়বে ? যদিও বাসি প্রশ্ন, সত্যি কথা বলতে কি তবু একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাকে উত্তরটা দিয়েছিলাম, গতবছর ৬ আগস্ট চারটের ট্রেন ছেড়েছিল চারটে পঞ্চাশ মিনিটে। ফেরিওয়ালার প্রশ্নের মধ্যে যুক্তি আছে। ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম। দুদিন পর এক সকালে মোহন-বাগান ও ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে হাজির হলাম। মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা অনুশীলন শেষ করে গল্পগুজব করছে। পি কে ব্যানার্জি তখন দাড়িতে সাবান লাগাতে ব্যস্ত। পি কে-র পাশেই বসে আছে সুব্রত ভট্টাচার্য। সুব্রতর পাশে শ্যাম থাপা। টেন্টের বাইরে গাছের নীচে একটা বেঞ্চে একাই বসে আছে দিলীপ পালিত। ও আমায় হাত নেড়ে ডাকতেই দিলীপের পাশে গিয়ে বসলাম। দিলীপকে প্রশ্ন করলাম ঃ তুমি তো এবার দলের অধি-নায়ক। গতবছর পঞ্চাশ মিনিট দেরিতে মাঠে নামার ঘটনা নিশ্চয়ই মনে আছে। তোমার উপর অনেক দায়িত্ব। এবারও কি ওইরকম তুকতাক হবে ? দিলীপ দ্বিধাহীন-ভাবে জানাল, না না, ওরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। সুযোগ বুঝে পি কে-কে সেকথা মনে করিয়ে দিতেই পি কে প্রথমে পাশ কাটিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। পি কে বলে চললেন, এই তো স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৬৪ মিনিট রুখে দিল মোহনবাগানকে। আর শেষ ছ'মিনিটে তিনখানা গোল। শেষের দশ মিনিট আমি দলকে খেলালাম কাপ উইনার্স স্টাইলে। অনেক রকম স্টাইলে আমি টিমকে এক্সপেরিমেন্ট করে থাকি। স্কটল্যাণ্ড স্টাইল, ইউরোপিয়ান স্টাইল, ল্যাটিন, আমেরিকান স্টাইল। সেদিন সব স্টাইলই যখন আমার ব্যর্থ হল তখন শেষের দশ মিনিট আমাকে ওই কাপ উইনার্স স্টাইলটাই ধরতে হল। সে খেলাটা হল ঃ যে যেখান থেকে পারো গোলের মুখে বল ফেল। এবং বল ফেললেই তো আর হবে না। ভাল একজন হেডার দরকার। আবার শুধু হেড করলেই হবে না, সে হবে একজন বিচিত্র খেলোয়াড়। সাধারণ খেলো-য়াড়দের চেয়ে সে হবে অন্য ধরনের। ভয়ে সে নিজেকে কুঁকড়ে রাখবে না। দর্শকদের গালাগালিও তাকে দমাতে পারবে না। তার লক্ষ্য হবে কাপ জয়ের খেলা। তাই আমি সুব্রতকে স্ট্রাইকারে খেলাই। এবং শেষ ছ মিনিটে ফলও পাই। আর একজনও সে খেলা খেলতে পারে। সে গৌতম। সত্যিই, ৭ জুলাইয়ের খেলায় একটা নতুন ছক ভেবেছি এবং সেইমত অনুশীলনও চালাচ্ছি। তারজন্য হয়ত আমাকে শ্যাম ও রণজিতকে স্ট্রাইকারে খেলাতে হবে। এবং উলাগাকেও সেই ছকে আনছি। তারপর খেলার দিনই চূড়ান্ত টিমের কথা ভাবব। জানিনা, কে কিভাবে আমার 'এ' ছকটা নিতে পারবে! পি কে বললেন ঃ গত-বছর ওটা ছিল একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা। এ ঘটনা আর কখনও হওয়া উচিত নয়। গতবছরও আমি চেয়েছিলাম ঠিক সময় খেলা আরম্ভ হক। কিন্তু বাধা পেয়েছি কয়েকজনের কাছ থেকে যা আমি একবছর পরে তুলতে চাইনা!

ওদিকে অরুণ ঘোষ অনুশীলনের পর ছুটতে ছুটতে টেন্টের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। দেখা হল ফুটবল সম্পাদক পরেশ সাহার সঙ্গে। সকলের কাছে কিন্তু আমার ওই একই প্রশ্ন। পরেশ সাহা বললেন, না-না, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। গত বছরের ওই পঞ্চাশ মিনিট বিলম্বের ফলে কত লোকের হয়রানি হয়েছে। সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি কেউই দুটো টিমকে ছাড়েনি'। তার চেয়ে বড় কথা, কত লোক এ খেলা দেখতে অনেক দূর দূর থেকে ট্রেনে করে এসেছিলেন। তারাও ওই বিলম্বের ফলে ট্রেন মিস করেছেন। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না—আমাদের তরফ থেকে পরিষ্কার করে বলতে পারি। অরুণ ঘোষ তখন স্নান সেরে টেন্টে টাঙানো মাকালীর ছবিটার দিকে চেয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে। তাকে আর বিরক্ত না করে পাশে দাঁড়ানো অধিনায়ক প্রশান্তকে ওই একই প্রশ্ন করলাম। প্রশান্ত খুব জোরের সঙ্গেই জানালো—ওই ঘটনা আর এবছরে ঘটবে না এটা আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি। ওদিকে রেফারি টেন্টের খবর ঃ সাতই জুলাই যিনিই রেফারি থাকুন নির্দিষ্ট সময়ে খেলা আরম্ভ করার দৃঢ় সঙ্কল্প তারা নিয়েছেন। এটা শুভ লক্ষণ। এখবরে নিশ্চয়ই সকলে স্বস্তি পাবেন। কিন্তু সেই ফেরিওয়ালার কথাগুলো কেমন যেন ঘুরে ফিরেই আসছে। সাতই জুলাই চারটের ট্রেন ঠিক চারটেতে ছাড়বে তো ?

পুনশ্চ ঃ এই রচনার পর খবর পেলাম পি কে নাকি ৭ তারিখে কলকাতায় থাকছে না। তার আগেই যাচ্ছেন মাদ্রিদ।

মোহনবাগান / ইস্টবেঙ্গল

কিছু অ-নিরপেক্ষ ভাবনা

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আমাদের দেশে নিরপেক্ষতা একটা গুণ বলে বিবেচিত হয়। ভারত জোট নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। তাই বোধহয় আমরা সব সময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখবার চেষ্টা করি। অথচ আমরা তো নিরপেক্ষ নই। কি ভাগ্যিস্ নই! আবার যাকে আমি নিরপেক্ষভাবে ভালবাসা যায় কি না সেটা যদি বিচার করতে বসতাম তাহলে কি সর্বনাশের ব্যাপার হতো! আমি তাই কখনো নিরপেক্ষ হতে চেষ্টা করি না। তাহলে জীবনের আসল আনন্দই মাটি হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জতে আমি ভারতকে সমর্থন করি; একদিন কোন একজন ভারতীয় উইম্বলডন জিতবে ভাবতে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। আর সে যদি বাঙালী হয়, উত্তরে বাস! তাহলে একসঙ্গে ইলিশ, চিংড়ী, মাংস সব খাব। সন্তোষ ট্রফিতে আমি পশ্চিমবঙ্গের সমর্থক, ক্রিকেট টেস্টে ভারতবর্ষের আর ভারতীয় ফুটবলে আমি মোহনবাগানের সমর্থক। গোঁড়া অন্ধ? যাই বলুন না কেন—আমি মোহনবাগান। নামের মধ্যেই যেন সুরের রেশ। তাই আমি বিশ্বাস করি যে, খেলার আসর যে গোঁড়া ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক এতে দোষের কিছু নেই। দোষ ওই নিরপেক্ষ সাজায়।

পাঠক, আপনি নিশ্চয় ইস্টবেঙ্গল দলের সমর্থক। নইলে খেলার আসর পড়বেন কেন? দোহাই, এই পর্যন্ত পড়েই পড়া বন্ধ করবেন না। আমার দুঃখটা একটু শুনুন। এই শহর কলকাতাটা একদিন মোহনবাগানের ছিল। মোহনবাগান যেদিন জিতত, সেদিন জাতীয় আনন্দ পালিত হত। হারলে আজকাল আপনারা যেমন বোমা পটকা ফাটান সেরকম কিছু হত না। আর আজ আমরা সংখ্যালঘু। নিজদেশে পরবাসী আর কাকে বলে? যতগুলো কাগজ বেরোয় খেলার প্রায় সব কটা ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক। এইযে ধারাভাষ্যকাররা আছেন, তাদের মধ্যে কোন মোহনবাগান দেখেছেন? এই তো সেদিন শুনছিলাম, মিহির বসু বল নিয়ে চলেছেন। এইমাত্র সেন্টার লাইন পেরিয়ে গেলেন। বিপক্ষ সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। ওই যাঃ, টাল সামলাতে গিয়ে পড়ে গেলেন। বুঝলেন—দা, যদি না পড়ত, 'মিহির তাহলে নিশ্চয় একটা গোলের সুযোগের সুযোগ এনে দিতে পারত।' আর মোহনবাগানের এবছর বহু গোল নাকচ হয়েছে ওই একই ভাষ্যকারের ভাষায় 'অতি ন্যায়সঙ্গত কারণে।' তাই বলে কি আর আমি রেডিও শুনি না, না খেলার আসর পড়ি না?

গোলাপের যুদ্ধ, ক্রুসেড, বিজয়নগর বাহমনীর যুদ্ধ—সব তুচ্ছ হয়ে গেছে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মহারণের কাছে। (সম্পাদক এটাকে নিশ্চয় ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান বলে শুধরে নেবেন, তা নিন)। খেলার আগে থেকেই কাগজগুলো তাতাতে থাকে। কোন কাগজ লেখে কিভাবে পায়াস গোল করবেন একদিকে, অন্যদিকে লেখা থাকে কিভাবে সাবির আলি গোল করবেন। ওইসব বাবুরা নিরপেক্ষ হতে চাইছেন যে। তারপর খেলার দিন অভিমত থাকে অধিনায়ক প্রশিক্ষক সকলের। পরের দিন তো খেলা নিয়ে মহাকাব্য লেখা হয়। মোহনবাগান যে বছর জেতে সেবছর খবরের কাগজ দেরিতে আসে। আমি দুবার করে পড়ি বিবরণগুলো। তারপর আবার দুপুরে পড়ব বলে রেখে দিই। আর ইস্টবেঙ্গল জিতলে



কাগজটা তাড়াতাড়ি আসে। ধরতেই ইচ্ছা করে না। মনে হয় খেলা নিয়ে বিশেষ আদিখ্যেতা চলেছে। মনে হয় যদি খেলার দিন আমেরিকা রাশিয়ার মধ্যে হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে মারামারি লেগে যায় তাহলেও আনন্দবাজার-যুগান্তর সে খবর ছাপাবে না। তখন মনে হয় এ শহরে তো বহু ভদ্রলোক আছেন যারা খেলা পছন্দ করেন না, তারা কেন বাধ্য হবেন এইসব ছাইপাঁশ পড়তে।

মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল নিয়ে আমার সমস্যার অন্ত নেই। মোহনবাগান জিতলে আমার গৃহিণী বলেন, খেলাটা জীবনমরণ সমস্যা নয় যে তাই নিয়ে এত মাতামাতি করতে হবে। সৌভাগ্যের কথা পুত্রভাগ্য আমার ভাল। কন্যা মোহনবাগান ছিল, তারপর এক সময় বলেছিল, বাবা মোহনবাগান এত হারে কেন? আমি যে আর সাপোর্ট করতে পারছি না। বন্ধুবান্ধব এক ধারসে ইস্টবেঙ্গল। এক বন্ধু সুহাস সেন খুব নামজাদা ব্যারিস্টার। মোহনবাগান হারলেই আমায় টেলিফোন করে—কি রে কি হল? ভাল আছিস তো? আমার গা রী রী করে। আর যখন ইস্টবেঙ্গল হারে, সে দিন আমার হয়তো মনে হয় সুহাসকে টেলিফোন করি। যদি অঘটনক্রমে আমি লাইন পেয়ে যাই তখন বলে 'বয়স তো অনেক হল, এইসব ছেলেমানুষী এবার বন্ধ কর।' এরপর অফিস। সেখানে দুটি মহিলা আর কয়েকজন ভদ্রলোক ছাড়া সব ইস্টবেঙ্গল। অফিসেই সময় বেশী কাটাই সুতরাং শত্রু-পুরীতেই থাকি বলতে পারা যায়।

তবে আমার সেদিন খুব আনন্দ হল। বন্ধুবর জ্যোতি দাশগুপ্ত কাঠ বাঙ্গাল। ইউরোপ আমেরিকা এমন কি খাস কলকাতায় এতদিন থেকেও শুদ্ধ বাংলা বলতে পারে না। বন্ধুপত্নীও বিদূষী সুন্দরী কিন্তু ভাষাটা প্রাকৃত। সেই বাড়িতে দেখলাম, কনিষ্ঠ পুত্র মোহনবাগান সমর্থক। সেইরকম আনন্দ হয়েছিল একবার মোহনবাগান জেতবার পর সন্তোষপুর গিয়ে। পিতা-পুত্রে আবিষ্কার করেছিলাম, সেখানে অনেক মোহনবাগানের ফ্ল্যাগ উড়ছে। আমার নিজস্ব ভ্রাতাদের মধ্যে দু'জন ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। সুতরাং বাঙাল-ঘটি ব্যাপারটা এখন মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের ব্যাপার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ভালই।

৭ তারিখ আমি মাঠে যাব না। আমার মোহনবাগানের কার্ড বেশ কিছুদিনের পুরাতন, কিন্তু সচল। তবু যাব না। কারণ মোহনবাগানের গ্যালারিতে একটা বিপ্লব এসে গেছে। আমি যাদের সঙ্গে খেলা [illegible] যেন উবে গেছে। [illegible] ভাষা বুঝি না। তাদের [illegible] নিতে পারি কিন্তু [illegible] অগম্য। আমি মোহনবাগান [illegible] দশক ধরে। এর মধ্যে [illegible] হেরেছে, ড্র করেছে। [illegible] স্বর্গ পেয়েছি কিন্তু [illegible] মারতে ইচ্ছা করেনি। [illegible] গিয়েছে। আমি চুনী [illegible] সঙ্গে খেলায় পেনাল্টি [illegible] হতে দেখেছি। [illegible] কথা মনে হয়নি। [illegible] খেলা দেখবো [illegible] ৫—০ গোলের হারের [illegible]। কিন্তু জানি, হবে [illegible] শোক ভোলাতে ইলিশ [illegible] জিতলে গৃহিণীর [illegible]। আমি সারা বছর [illegible] ইলিশের জন্য। [illegible] আর বাগদা চিংড়ী [illegible] নেই।

আপনাদের [illegible] করি। বেশীদিন আগের [illegible]— ইস্টবেঙ্গল একই [illegible] শেষ খেলা। [illegible]— খিদিরপুর খেলা [illegible] ইস্ট-বেঙ্গল—এরিয়ান [illegible] দরকার মোহনবাগানের [illegible] জন্য। সেদিন মোহনবাগান [illegible] গোল দেবে না। [illegible]। শেষে খিদিরপুরের [illegible] আমরা পেনাল্টি [illegible] সিং দ্বিতীয়বারের [illegible] খেলা শেষ হতে [illegible] কেতন ওড়াও হে [illegible] কেউ কেউ নাচছিল [illegible] দু'জন লাল-হলুদ [illegible] এল চুনী কিষাণ [illegible] বলতে। ইস্টবেঙ্গল হেরে [illegible] কাছে। তবু রামবাহাদুর [illegible] এসেছে শর্ট টেস্টে [illegible] হেরে গেছে বলে [illegible] আমরা ওদের [illegible] মিষ্টি খাইয়েছিলাম

এইতো [illegible] এখন এ দৃশ্য [illegible] আসে না কেন?



দুঃখীরাম কোচিং সেণ্টারে কোচ অমৃত চক্রবর্তী প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ছেলেদের/শঙ্কর

মিনি ফুটবলকে ফিরিয়ে আনুন

চুনী গোস্বামী : আজকাল প্রায়ই কলকাতার ময়দানে যে ফুটবল খেলা হচ্ছে সেটা খুব উচ্চমানের নয় কিংবা অন্য কথায় বলতে গেলে আজকের কলকাতায় ফুটবলের মান যা দাঁড়িয়েছে তা গত পঞ্চাশ বা ষাট দশকে যা ছিল তার থেকে অনেক নিম্নগামী, সেই মান নির্ণয় প্রসঙ্গে নানাবিধ এবং বহু মতবাদ শোনা যাচ্ছে। যার মূল কথা আমাদের কলকাতার তথা ভারতীয় ফুটবলের তেমন জৌলুস আর নেই। আমি ব্যক্তিগত-ভাবে এই সব উক্তি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ ফুটবল খেলার মান এমনই একটা জিনিস যা বহু কিছুর উপর নির্ভর করে এবং সব সময়েই এটা পারিপার্শ্বিক অবস্থানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেইজন্য আজকের ফুটবলের মান গত দু'দশকের থেকে অনেক খারাপ,এটা এক কথায় আমি মানতে রাজী নই।

যাই হোক মান নির্ণয়ের প্রসঙ্গে না গিয়ে আমি আমার আসল বক্তব্যের স্বপক্ষে কিছু মত পেশ করতে চাই। আমরা জানি এবং বহুবার বহু জায়গায় বলা হয়েছে যে ফুটবল খেলা ছেলেদের খুব অল্প বয়সেই ধরে দিতে হবে। অন্য কথায় ইংরেজিতে বলতে গেলে 'ক্যাচ দেম ইয়ং'। এখন এই যে ছোটদের খেলা ধরানো বা উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য এই নয় যে তাদের আমি শুরু থেকে একটা বাঁধা ধরা বা ছকে বাঁধা প্রশিক্ষণের জালে আবদ্ধ করতে চাই না। প্রশিক্ষণের উপযোগিতা যে আছে সে ব্যাপারে আমি কোন সন্দেহই পোষণ করি না এবং বড় খেলোয়াড় হতে হলে খেলোয়াড়-দের প্রশিক্ষকের কাছে ভুল ত্রুটি শুধরে নেওয়া যে একান্ত দরকার তা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। কিন্তু প্রশিক্ষণের নামে একজন উঠতি বা ছোট খেলোয়াড়কে শুধুমাত্র সেট প্রিন্সিপাল বা বাঁধাধরা কতগুলো নিয়মের মধ্যে ফেলে দেওয়া—আমার মতে একেবারে উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে একটি ব্যাপারে আমি আজ বিশেষ করে জোর দেবো তা হ'ল ছোট ছেলেদের ছোট মাঠে নানা সহজ নিয়মের মধ্যে দিয়ে তাদের কম্পিটিটিভ ম্যাচ-এর যে সার্থকতা আছে তা সহজে বোঝানোর সময় এসেছে বলে বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করি। পুরোনো যারা আজও ফুটবলের উন্নতির জন্যে চিন্তা করেন তারা হয়তো একটা জিনিস এখনও মনে করতে পারবেন যে কলকাতার বহু জায়গায় পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে আণ্ডার হাইট ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রচলন ছিল। শৈশবে ওই সব প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পরবর্তী জীবনে বহু খেলোয়াড় কলকাতা ময়দানে ভাল খেলোয়াড় হিসেবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকদের দ্বারা আয়োজিত এই সব খেলার আসর প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছে। ছোটদের জন্য ওই সব খেলার আসর বন্ধ হবার ফলেই খেলোয়াড়ের মান পড়ে যাচ্ছে তা সরাসরি বলতে চাই না। কিন্তু একজন ভাল খেলোয়াড় হতে হলে এই সব মিনি ফুটবল প্রতিযোগিতা বা আসরের যে প্রয়োজন আছে তা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি। এর বিশেষ কারণ হল যখনই এই ছোট ছোট ছেলেরা ৬ জন বা ৭ জনের দল নিয়ে কোন কম্পি-টিটিভ ম্যাচ খেলতে আসে তখন তারা পরিপূর্ণ-ভাবে জানে না কে ফরোয়ার্ড, কে ব্যাক অথবা কে হাফ ব্যাক-এ খেলবে। এই ছয় বা সাত জন ছেলেকে ওই সব ম্যাচে কখনও ফরোয়ার্ড, কখনও হাফ ব্যাক অথবা কখনও বা ব্যাকের ভূমিকা নিতে হয়। একজন খেলোয়াড়কে তখন অল্প বয়সে ওই বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হয়। কারণ মাঠ খুব ছোট থাকায় তাদের সব জায়গায় ঘুরে ফিরে খেলতে হয়। তখন খুব অল্প বয়সেই টোটাল ফুটবলার হওয়ার বিশেষ গুণাবলী ধীরে ধীরে তৈরি হয়। এই যে টোটাল ফুটবল প্লেয়ার হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ যা আজকের মডার্ন ফুটবল-এ একান্ত প্রয়োজন সেটা কেবলমাত্র ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কিংবা একঘণ্টা বা আধঘণ্টা একজন বিশেষ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শুধুমাত্র পুশিং, কিকিং, হেডিং-এর মাধ্যমে আনা যায় না। তাই বলে কখনই প্রশিক্ষণকে বাদ দিতে বলবো না। কিন্তু খুব ছোটবেলা থেকেই ছোট মাঠে একেবারে বড় ম্যাচ-এর অনুকরণে কম্পিটিটিভ টুর্নামেন্ট-এর একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই ন্যাচারাল প্লেয়িং এ্যাবিলিটি কিংবা বল সেন্স বা পজিসনাল সেন্স শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের দ্বারাই সম্ভব নয়। ছোটদের অল্প বয়সে খেলার মাধ্যমে তাদের ন্যাচারাল খেলো-য়াড় বৃত্তিটা গড়ে উঠতে পারে এবং এই খেলার আনন্দের মাধ্যমে একটা ছোট ছেলে যত তাড়াতাড়ি খেলার নানাবিধ গুণাবলী শিখতে পারবে ততটা প্রশিক্ষণের মধ্যে সম্ভব হয়ে ওঠে না। মিনি ফুটবলের প্রবর্তন আমাদের এই অভাব দূর করবে। ছোট ছেলেদের জন্য অভিজ্ঞতা থেকে বলবো তাদের এই মিনি ফুটবলে খেলার সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা স্থানীয় ক্লাবগুলো যাতে করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে এবং উদ্যোগী হতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার দ্বারা কলকাতার ফুটবলের সামগ্রিক উন্নতি হবে। অর্থাৎ ফুটবলের সামগ্রিক উন্নয়নে অতীত দিনে আজকের ভুলে যাওয়া মিনি ফুটবল খেলার প্রচলন ছিল তার পুনরুজ্জীবনের আবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রশিক্ষণ সেই ব্যবস্থার ওপর একটি অতিরিক্ত সংযোজন হবে এটাই চাইছি।

(সৌজন্য : সাউথ ক্যালকাটা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন)

ভিন রাজ্যের সুপার-স্টারদের কলকাতায় এ হাল কেন

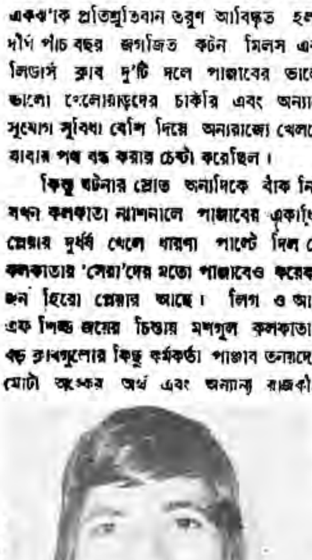
দিলীপ সরকার : ফুটবল মরশুম শুরুর আগে অন্য রাজ্যের খেলোয়াড়দের ঘিরে যে ধরনের প্রত্যাশা ছিল তা আংশিকভাবে পূরণ হয়নি লিগের পাঁচটি সপ্তাহ অতিক্রান্ত হবার পরও। বাইরে থেকে আসা খেলোয়াড়রা কলকাতার ঘরানার খেলা চট করে রপ্ত করতে বাধা পাচ্ছেন নানা কারণে।

একাশি বছরের লিগ ইতিহাসে বাংলার বাইরে থেকে বহু ফুটবলার গড়ের মাঠ মাতিয়ে গেছেন এবং অনেক খ্যাতনামা সাফল্য না পেয়ে ফের ঘরে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। আবার একই মরশুমে কলকাতায় এত তারকার সমাগম অতীতে কখনও হয়নি' ঊনআশিতে যেমন ঘটেছে।

সত্তরের দশকে কলকাতায় অন্য রাজ্যের ফুটবলারদের মধ্যে দক্ষিণ ভারত যোগান দিয়েছে সবচাইতে বেশি। দক্ষিণের রাজ্যগুলো ভাল ফুটবল খেলাও রপ্ত করেছে বাংলার মতোই। তবে বাংলার পরই ভাল খেলায় দখল পায় পাঞ্জাববাসীরা। সেই কবে জার্নেল সিং গড়ের মাঠ দাপিয়ে গেছেন এবং পরে একমাত্র পাঞ্জাব তনয় গুরুকৃপাল সিং '৬৬ ও '৬৭-তে খেলেছিলেন ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানে। মাঝের এই দীর্ঘ বছরগুলোতে—পাঞ্জাবের দলগুলোর প্রচুর দাপট ছিল জাতীয় ফুটবলের আসর ছাড়াও ডুরাণ্ড, ডি সি এম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতায়। জার্নেল সিং কলকাতা ছেড়ে পাঞ্জাবের কোচিং-এর দায়িত্বভার পাবার পরই বিভিন্ন কারণে ওই রাজ্যের খেলোয়াড়দের কলকাতায় আসা বন্ধ ছিল। পাঞ্জাব ফুটবলের সর্বময় কর্তা দোয়ারকাদাস সায়গল ওই রাজ্যের ফুটবলারদের আটকে রাখার জন্য নানা সুযোগ সুবিধা দিতেন। পাঞ্জাবের সেরা খেলোয়াড় ইন্দার সিং'ও কলকাতার ক্লাবগুলোর ডাকে সাড়া না দিয়ে একনাগাড়ে দাপটে খেলে দেশের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন। চুয়াত্তরে জলন্ধরে সন্তোষ ট্রফি জয়ের পরই পাঞ্জাবে আরও একঝাঁক প্রতিশ্রুতিবান তরুণ আবিষ্কৃত হল: দীর্ঘ পাঁচ বছর জগজিত কটন মিলস এবং লিডার্স ক্লাব দু'টি দলে পাঞ্জাবের ভালো ভালো খেলোয়াড়দের চাকরি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বেশি দিয়ে অন্যরাজ্যে খেলতে যাবার পথ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু ঘটনার স্রোত অন্যদিকে বাঁক নিল যখন কলকাতা ন্যাশনালে পাঞ্জাবের একাধিক প্লেয়ার দুর্ধর্ষ খেলে ধারণা পাল্টে দিল যে কলকাতার 'সেরা'দের মতো পাঞ্জাবেও কয়েকজন হিরো প্লেয়ার আছে। লিগ ও আই এফ শিল্ড জয়ের চিন্তায় মশগুল কলকাতার বড় ক্লাবগুলোর কিছু কর্মকর্তা পাঞ্জাব তনয়দের মোটা অঙ্কের অর্থ এবং অন্যান্য রাজকীয়





সুবিধার টোপ ফেললেন সেই সময়েই।

মহমেডান স্পোর্টিং-এর কোচও পরের বছর দলকে প্রচণ্ড শক্তিতে সাজাবার ইচ্ছায় তার নিজ রাজ্য কেরালা থেকে বহু প্লেয়ার নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করলেন।

ইতিমধ্যে জবর ঘটনা ঘটে গেল লিডার্স ক্লাব ভেঙে যাওয়ায়। দোয়ারকাদাস সায়গল—যার আন্তরিক প্রচেষ্টায় শুধু লিডার্স ক্লাবের সুনাম ছড়ায়নি, গোটা পাঞ্জাবের ফুটবল খেলার সুনাম ছড়িয়েছিল—তার সঙ্গে খটমটি বাঁধল রাজ্য ফুটবলের অন্যান্য কর্তা এবং লিডার্স ক্লাবের কিছু প্লেয়ারের। ক্লাব ভেঙে যাওয়ায় খেলোয়াড়রা ভবিষ্যতের চিন্তায় কলকাতায় খেলার বন্দোবস্ত পাকা করলো। পাঞ্জাব ও বাংলার মধ্যে ফুটবল



নিয়ে রেষারেষি এবং বহুদিনের ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারটা চুকলো।

কলকাতার তিন বড় দলের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডানই বেশি অন্য রাজ্যের প্লেয়ারদের ঠাঁই দিয়েছে। মোহনবাগানে খেলছে একমাত্র জেভিয়ার পায়াস।

পায়াস কলকাতায় পা দিয়েই চুটিয়ে প্র্যাকটিস করেছে এবং স্থানীয় প্লেয়ারদের সঙ্গে চটজলদি ভাবসাব করে সুন্দর বোঝাপড়া গড়ে নিয়েছে। লিগ শুরুর আগেই কলকাতা, উত্তরবঙ্গ, নদীয়া ও হাওড়ায় মোহনবাগান কয়েকটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিল। সবকটা ম্যাচেই পায়াস নিজেকে জাহির করেছে মোহনবাগানের প্রথম এগারো জনের স্ট্রাইকার পজিশনটি পাকাপাকি পাবার। কোচ প্রদীপ ব্যানার্জি সে সুযোগও ওকে দিয়েছেন লিগের প্রথম আটটি ম্যাচেই নামিয়ে। গোড়ার কয়েকটা ম্যাচে প্রচুর তারিফ পেয়ে এবং গোল করে পরে পায়াস খানিকটা নিষ্প্রভ হয়ে যায় মোহনবাগান-জর্জ টেলিগ্রাফ ম্যাচের পরেই। এর আগে পোর্টের সঙ্গে খেলাটিতে সে পায়ে চোট পেয়েছিল। ক্রমশই ওর সেইসব স্পিড এবং দ্রুত বল নিয়ে ডিফেন্স চেরার কায়দা-কানুনে ঢিলেমি ভাব দেখা যাচ্ছে ভয় ভয় ভাবের জন্য। তবে কলকাতার কম শক্তিশালী দলগুলোর ডিফেণ্ডারদের এতো টাফ খেলার বিরুদ্ধে পায়াস শক্ত হতে পারবে অল্প সময়েই। জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে ম্যাচটিতে ও পায়ে মাথায় ছোটখাটো চোট পেয়েছিল বহুবার। পায়াস খুব উঁচু ধরনের খেলোয়াড়—এ ব্যাপারটায় এখন কারও দ্বিমত নেই।

ভিন্ রাজ্যের খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হৈ হৈ ব্যাপার যাকে নিয়ে হয়েছিল, সেই হরজিন্দারের পরীক্ষা এখনও হয়ে ওঠেনি। সামান্য কিছু কিছু চোট পেয়েছিল প্র্যাকটিসের সময়ে। লিগের একটা ম্যাচে ওকে দেখা গেছে ৩৫ মিনিট মাত্র খেলতে। খেলেছিল টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিরুদ্ধে। ওই ম্যাচটাতে ইস্টবেঙ্গল কোনরকমে একটা গোল করে ফেলেছিল, তাই জয় হয়েছিল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই-এর ওই ম্যাচটায় হরজিন্দার প্রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলেছিল লেফট আউট পজিশনে। কলকাতা ন্যাশনালে দেখা সেই হরজিন্দারের কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যায়নি লিগের খেলায়। এরপরের চারটি ম্যাচেও হরজিন্দার ঝুঁকি নেয়নি ভাল না খেলতে পেরে দুম করে বদনাম কুড়োবার। আসলে হরজিন্দার একজন বড় দরের শিল্পী ফুটবলার। পাঞ্জাবের চাকরি হারিয়ে ওর সামনে এখন ভবিষ্যতের জন্য একমাত্র টার্গেট হলো ফুটবল খেলা। কমবয়সী সুদর্শন এই পাঞ্জাবী যুবককে ওত পেতে থাকতে হবে সময়ের অপেক্ষায়। শোনা যায় একদিন উইঙ্গারে খেলে জায়গাটা হরজিন্দারের বিশেষ পছন্দ হয়নি।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বাইরে থেকে এতো প্লেয়ার এনেছে তাতে বয়সীদের ভিড়ও কম নয়। তারা সবাই ভালো প্লেয়ার। কিন্তু কলকাতায় খেলা হঠাৎ রপ্ত করতে বয়স তাদের কাছে একটা মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তড়িঘড়ি শরীর তৈরি করে নিজ নিজ পজিশন অনুযায়ী মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটায় যথেষ্ট আন্তরিকতা আছে। কিন্তু ফল তেমন পাওয়া যায়নি।

মনজিত সিং বহুদিন থেকেই ভাল ফুটবল খেলে আসছে এবং ইস্টবেঙ্গলে আরো তুখোড় হয়ে খেলার জন্যও বেশি বয়সে নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করেছে। কোচ অরুণ ঘোষ ওর মধ্যে খেলা পেয়ে জায়গা অদল বদল করে গোড়ার দিকের বেশ কয়েকটা ম্যাচ খেলিয়েছেন। মিড-ফিল্ডার হিসাবে মনজিত মোটামুটি দায়িত্ববানের ভূমিকায় থাকলেও প্রয়োজনে নিচের দিকে নামা ওর পক্ষে সম্ভব হত না। পরের ম্যাচগুলোতে তাই ওকে ফরোয়ার্ডে খেলানো হয়েছিল। স্ট্রাইকার হয়ে মনজিতের খেলায় ভালই ফল পাওয়া যেত যদি তার ভাল সব কিছুর সঙ্গে স্পিডের ব্যাপারটা আরো বেশি থাকত।

গুরদেব সিং বরাবরই অভ্যস্ত দুমদাম খেলাতে। বুদ্ধি ওর চোখ খুলে দিয়েছে যে এ জিনিস দিয়ে কলকাতায় আদৌ টিকে থাকা যাবেনা। দুটো ম্যাচ খেলার পরে পরেই সমালোচনার ঝড় ওঠায় গুরদেব পরের ম্যাচগুলোতে মোটামুটি নিজেকে মানান সই করে নিয়েছে। সুযোগ পেলে ওর খেলায় আরো কিছু উন্নতি অবশ্যই চোখে পড়বে। তাছাড়া বাইরে থেকে আসা অন্য প্লেয়ারদের মত গুরদেব তেমন সুযোগ পা[য়নি] ক্লাবের সবার সঙ্গে চুটিয়ে প্র্যাকটিস করার।

প্রথমে দারুণ বিরূপ সমালোচনার পর সবাইকে অবাক করে ইস্টবেঙ্গলের আরকট দ্বারস্বামী দেবরাজ পাকা ব্যবস্থা করে নিল মাঝমাঠে প্রশান্তর পাশের জায়গাটিতে। নিকট ভবিষ্যতেই দেবরাজ কলকাতার মাঠে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতে পারবে।

অল্পবয়সী ম্যাথুজের খেলা দেখতে ভাল। ঠিকমত ওভারল্যাপিং-এ বল নিয়ে ফরোয়ার্ডদের সঙ্গে অকুতোভয়ে সামিল হওয়া, ভাল ট্যাকলিং বা চটজলদি রিফ্লেক্স দেখে মনে হয় বড় ভাল প্লেয়ার কিন্তু তিনটে ম্যাচের পরে মালুম হচ্ছে অত্যন্ত প্রেসারে ম্যাথুজই নিজ দলের পক্ষে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে একদম খেলতে না পেরে। এ মরশুমে ম্যাথুজের কাছ থেকে ইস্টবেঙ্গল দল ভবিষ্যতেও আর তেমন কিছু বেশি পাবে না তা ওর খেলার ধরন-ধারণে পরিষ্কার হচ্ছে।

ডেভিড উইলিয়ামস যতটা না ভাল প্লেয়ার, তার চরিত্রে প্রচার ওকে অনেক বড় করে দিয়েছে। নাইজেরিয়ায় ও খেলত অল্প বয়সে। পড়াশুনার সুবাদে ও ভারতে এসেছিল। ছিল তিনটি বছর তামিলনাড়ুতে। ওই রাজ্যের হয়ে সে দু'টো ন্যাশনাল খেলেছিল এবং চট করেই চোখে পড়েছিল। তামিলনাড়ুতে তেমন কিছু ভাল ফুটবলার নেই। ওইরকম পরিবেশে ডেভিডের খেলার উন্নতিও সেভাবে হবার কথা নয়। ও খেলত ওর নিজস্ব স্টাইলে বহু আগে তার স্বদেশেই রপ্ত করেছিল। ইস্টবেঙ্গলে এসে কোচ অরুণ ঘোষের কাছে তালিম নিয়ে কলকাতার খেলা রপ্ত করবার চেষ্টায় ও মশগুল। এখন পর্যন্ত ওর অসাধারণ স্যুটিং ক্ষমতা ছাড়া অতি চমকপ্রদ আর কিছু আমরা দেখতে পাইনি।

মহমেডান স্পোর্টিং শুধু এবছরেই নয়, গত কয়েক বছর ধরেই টুকটাক প্লেয়ার আনছে অন্য রাজ্য থেকে। তবে এবছরে আনা কয়েকজনের সুনাম ছিল আগেই এবং তা কলকাতা ময়দানেও পরখ করা গেছে। তবে নাজিব যেমন ছিল, লিগ ম্যাচে তেমন খেলা পাওয়া যাচ্ছে না। দীনকর সুবিধা পাবেনা এমরশুমে তা পরিষ্কার হয়েছে। প্রেমনাথ ফিলিপই একমাত্র মহমেডানের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় প্রমাণ করেছে।

ইরান থেকে পড়তে আসা সানজারিকে নিয়ে বেশি মাতামাতি হয় বিদেশী বলেই।

অন্য রাজ্যের প্লেয়ারদের গড়ের মাঠে চট করে প্রতিষ্ঠা পাবার প্রধান বাধা এ মরশুমের গোড়াতেই হঠাৎ করে অদ্ভুত গা প্যাচপ্যাচে গরমের ঝামেলা। কঠিন ব্যাপারগুলোকে সহজ করে খেলতে পারা তাইতেই হয়ে উঠছে না।

সব চাইতে বড় অসুবিধা এখানকার দর্শকদের উন্মাদনা এবং জয়ের প্রত্যাশা। ভাল ভাল ফুটবলারদের হঠাৎ করে কলকাতার দর্শকদের চোখের সামনে নিজস্ব খেলা পরিষ্কার ভাবে খেলতে পারা বরাবরই কষ্টকর।

এব্যাপারটা অতীতেও ছিল এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি হবেই।

"আইসক্রীম বলতে কোয়ালিটি"

দেখা যাক আপনিও একমত কিনা

১ এগিয়ে থাকার কোয়ালিটি

কত ব্র্যাণ্ড তো বাজারে এলো গেলো। সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কিন্তু একমাত্র Kwality এবং ৩৫ বছর ধরে এর নাম আইসক্রীমের জগতে প্রথম সারিতে রয়েছে। এখন কলকাতায় দশটি আইসক্রীমের মধ্যে কম-সে-কম সাতটি'ই Kwality-র।



২ উপাদানের কোয়ালিটি

অগ্রণী হতে গেলে অনেক কিছুর উপর নজর রাখতে হয়। এই কারণেই Kwality আইসক্রীম তৈরী হয় সেরা উপাদান দিয়ে। এতে আছে দুধ, মাখন, চিনি, ফল, বাদাম এইসব। মেশানো থেকে প্যাকেটে ভরা পর্যন্ত সবটাই হয় অটোমেটিক মেশিনে, তাই কোথাও হাতের ছোঁওয়াটুকু পর্যন্ত লাগেনা। Kwality আইসক্রীম সম্পূর্ণভাবে পাস্তরাইজড অর্থাৎ বীজাণুমুক্ত। সবসময়ে টাটকা ও মজাদার। প্রতি চামচেই ঘন মোলায়েম ক্রীম...জিভে ঠেকালেই—আহা কী দারুণ স্বাদ!

এছাড়া প্রত্যেকটি ব্যাচ যাচাই করে দেখা হয় যতটা পরিমাণে থাকার কথা ঠিকঠিক আছে কিনা ... আর খাদ্যগুণ ঠিক আছে কিনা।

৩ বিভিন্ন স্বাদের কোয়ালিটি

কোন্ বা স্টিক, কাপ্ বা ব্রিক্ যাই হোক না কেন, Kwality মানেই উৎকৃষ্ট কোয়ালিটি। খেতে মজা, গুণে রাজা–Kwality। ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি, চকোলেট...কেসর পেস্তা, কাসাটা, কেসর পেস্তা মালাই ...চক্-ও-নাট্ এবং টু-ইন্-ওয়ান্ ...টোস্টেড আমণ্ড্—এমনি আরো কত দারুণ স্বাদের মজা!

৪ আরেকটি গুণ—সহজে পাওয়ার কোয়ালিটি

সবাই পছন্দ করেন Kwality। তাই আমাদের দায়িত্ব সবার কাছে Kwality পৌঁছে দেওয়া। নীল-সাদা-ডোরা আঁকা Kwality আইসক্রীমের গাড়ি হরদম রাস্তায় টহল দিচ্ছে। তাছাড়া নানান হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিনেমা, দোকান, চিড়িয়াখানায় Kwality-র প্রায় শ-তিনেক খুচরো বিক্রির ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও সারা দেশে ছড়ানো আছে Kwality রেস্তোরাঁ। অর্থাৎ আপনি যেখানেই যান, সেখানেই পাবেন Kwality-র কোয়ালিটি।

আইসক্রীম বলতে কোয়ালিটি

Kwality

কোয়ালিটি আইসক্রীমস প্রাইভেট লিমিটেড ৭৪ ডায়মণ্ড হারবার রোড কলিকাতা ৭০০০২৩

‘বড় খেলার দিন আমরা এত টেনশনে ভুগতাম না’

অশোক চট্টোপাধ্যায়

ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানে খেলা থাকলে দুই দলের খেলোয়াড়দের মানসিক অবস্থা কেমন থাকে, বা কে কি করেন। প্রত্যেকেই কি দারুণ টেনশনে ভোগেন? না, অন্যান্য ‘ছোট’ দলের বিরুদ্ধে খেলার দিনের মত স্বাভাবিক থাকেন। অশোক চট্টোপাধ্যায় খেলেছেন দুই বড় দলেই। আগে ছিলেন মোহনবাগানে, তারপর যান ইস্টবেঙ্গলে। শুরুতে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তীকালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে তার কেমন মনে হত, অন্যরাই বা কি করতেন।



আমি মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল—দু' দলেই খেলেছি। লিগে দু'প্রধানের পারস্পরিক লড়াইয়ে কয়েক বছর যেমন মোহনবাগানের হয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে মাঠে নেমেছি, তেমনি পরের দিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে লড়েছি ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় হয়ে। '৬৩ থেকে '৬৮ সাল পর্যন্ত সবুজ মেরুন লাল হলুদ লড়াইয়ে আমি ছিলাম মোহনবাগানের পক্ষে। আবার '৬৯, ৭০, ৭১—এই তিন বছর এই বিশেষ ম্যাচে মাঠে বিচরণ করেছি লাল-হলুদ জামা গায়ে চাপিয়ে। লিগে প্রথম মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের কথা আমি আজও ভুলিনি।

যদি ভাল খেলতে না পারি, তবে সাপোর্টাররা কি ভাববে, এই চিন্তাই ঘুরছিল সারাক্ষণ। প্রথম বড় ম্যাচ। জানতাম, নিজেকে শো করাতেই হবে। এই ম্যাচটাই ভবিষ্যৎ জীবনের সোপান তৈরি করে দেবে। অতএব যদি এই ম্যাচে ঠিকমত খেলতে না পারি···

তবে এই দৃঢ় মনোভাবটা আমাকে চাঙ্গা করে রেখেছিল যে, যেভাবে হোক দক্ষতা প্রমাণ করতেই হবে। না হলে টিম থেকে বাদ যাবার আশংকা রয়েছে, কারণ আমার পজিশনে আরও প্লেয়ার আছে। আবার বুঝেছিলাম—এই ম্যাচে সফল হলে অনেক কিছু পাব। প্রথম মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ খেলতে নামার আগে শৈলেন মান্নার সেই কথা আজও স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি—‘দেখ, টিমে তুমিই সবচেয়ে ছোট। মাঠে গিয়ে ভালো খেলে তোমার যোগ্যতা প্রমাণ কর—এটাই আমি চাই।’

তিন চার বছর পরে এই ম্যাচ খেলতে নামার আগে ভাবতাম—আমি বাংলার জার্সি পরেছি, ইণ্ডিয়া খেলেছি, যথেষ্ট নামও হয়েছে। দল আজ আমার উপর অনেক নির্ভর করছে। সুতরাং ভাল খেলতে হবে। প্রত্যাশা মেটাতে না পারলে ক্লাব কর্তৃপক্ষের মন ভরবে না। পাড়ায় বা অফিসেও সমালোচনার মুখে পড়তে হবে।

তারও পরে শেষদিকে মনে হত—খেলা তো একটাই এবং সেটা হল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ। অন্য ম্যাচ নিয়ে ততটা ভাবনা ছিল না, নিজেকে কেন্দ্রীভূত করতাম এই ম্যাচটাতেই। যাবতীয় দক্ষতার প্রয়োগ ঘটাতে বদ্ধপরিকর থাকতাম। একটা কথা বলি, প্রথম দু-এক বছর ছাড়া এই লড়াইয়ের আগে আমি নারভাস হতাম কমই।

হাওড়ার ছেলে আমি। এবং ওখানে মোহনবাগান সমর্থকের সংখ্যা প্রচুর। অনেক বছর, শুধু অনেক বছর কেন, ফুটবল জীবনের অধিকাংশ সময়টাই খেলেছি মোহনবাগানে। তাই এই টিমের প্রতি দুর্বলতা থাকা আমার স্বাভাবিক। ৬৯-এ মোহনবাগান ছাড়তে বাধ্য হই। এবং সকলেরই জানা, ওই বছর একক লিগে ইস্টবেঙ্গল আমারই দেওয়া গোলে মোহনবাগানের বিপক্ষে জেতে। এর আগে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে মোহনবাগানের হয়ে ভালো খেললে বা গোল করলে যে রকম উষ্ণ ও আন্তরিক অভ্যর্থনা পেতাম, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখলাম। সবাই যেন একটু এড়িয়ে চলছে। এবং যারা কট্টর মোহনবাগান সমর্থক, তারা তো কিছু বলবেই। কেউ বলেছে—আমাদের ক্লাব থেকে সবকিছু শিখে আবার আমাদের গোলেই বল ঢোকালি। আবার কেউ বা দুঃখ বা রাগ চেপে না রাখতে পেরে বলেছে—বেইমান। আসলে ওরা ভাবতেই পারেনি, আমি ইস্টবেঙ্গলে যাব।

একটা কথা, এখন যেমন দু প্রধানের লড়াইয়ে আগে ক্ষেত্রবিশেষ খেলোয়াড়দের বেশ আগে একসঙ্গে টেণ্ট বা অন্য কোথায়ও জড়ো করার ব্যাপারটা দেখা যায়, তখন কিন্তু তেমন কোন ব্যাপার ছিল না। আসলে এখন টেনশনটা একটু বেশী। আমরা থাকতাম স্বাভাবিকভাবেই। দিনটার আলাদা কোন স্বাতন্ত্র ছিল না। কাটাতাম আর পাঁচটা দিনের রুটিনের মতই। অফিসও করতাম। তেমন কোন উত্তেজনা ছিল না। অন্য খেলার দিনের মতই টেণ্টে যেতাম, তবে একটু আগে। কিছুটা যে আলাদা ভাবনা ছিল না, তা নয়, তবে সেটা আমাদের উপর ব্যাপকভাবে চেপে বসত না। আর আমার যেন কেমন একটা ধারণা ছিল, এই ম্যাচটায় ভালো খেলবোই।

তিনটের মধ্যে টেণ্টে ঢুকে জামা-কাপড় ছেড়ে চা-টোস্ট খেয়ে নিতাম। তারপর ড্রেস করে সবাই একসঙ্গে বসতাম। কোচ উপদেশ দিতেন—আজ কিভাবে খেলব। এরপর অফিসিয়ালরা কিছু বলতেন। মোহনবাগানে থাকাকালীন মান্নাদাকে বলতে দেখেছি আর ইস্টবেঙ্গলে মনে আছে জ্যোতিষ গুহের সুন্দর স্পিচের কথা। অতঃপর দলের সিনিয়র প্লেয়াররা কিছু বলতেন। মোহনবাগানে থাকলে এই ভূমিকায় দেখেছি চুনীদা আর জার্নেল সিংকে। ইস্টবেঙ্গলে এই দায়িত্ব পালন করতেন প্রশান্ত সিংহ, শান্ত মিত্র'রা। এইসব হয়ে যাবার পর আমরা প্লেয়াররা সকলে মিলে প্রেয়ার করতাম। এবং তারপর, মোহনবাগানে থাকাকালীন কখনো টেণ্ট থেকে মাঠ বা ইডেনে চলে যেতাম। আর ইস্টবেঙ্গলে থাকাকালীনও কখনো টেণ্ট থেকে মোহনবাগান মাঠ বা ইডেনে পাড়ি দিতাম। এবং মাঠে নেমে শুরু করতাম লড়াই। এই বিশেষ ম্যাচের আগে প্লেয়ারদের কাছাকাছি বাইরের লোকদের খুব একটা ঘেঁষতে দেওয়া হত না এবং এখনও নিশ্চয়ই হয় না, যেটা অন্যান্য খেলার সময় হত বা হয়। এই খেলার আগে প্রতি প্লেয়ারই খুব চুপচাপ থাকত। তাই শুধুমাত্র ক্লাব অফিসিয়াল, কোচ এবং গুটিকয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকেই টেণ্টে অ্যালাউ করা হত না।

মোহনবাগানে থাকতে দেখেছি চুনীদাকে একটু বেশী টেনশনে ভুগতে। টেণ্টে এসেই হাত নেড়ে বলতেন—‘বুঝলি, আজ আমাদের যে করে হোক জিততে হবেই—মনে থাকে যেন। এটাই আমার শেষ কথা।’ তার কথায় আমরাও খুব ইন্সপায়ারড হতাম। আবার টেণ্টে আসা থেকে মাঠে নামা পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়টা কেম্পিয়াকে একদম চুপচাপ থাকতে দেখেছি, কোন কথা নয়।

ইস্টবেঙ্গলে দেখেছি, কোন প্লেয়ার হয়তো পুজো দেওয়া ফুল জামার পকেট থেকে বার করে ভক্তি চিত্তে মাথায় ছুঁইয়ে নিচ্ছেন। দুটো দলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতায় এও দেখেছি, কোন খেলোয়াড়কে মাঠে নামার সময় হয় প্রথম দিকে কিংবা মাঝে বা একেবারে শেষে থাকতে। আমারও এ ধরনের একটা ব্যাপার ছিল, সবসময় আমি বাঁ পায়ের মোজাটা আগে পরতাম।

ইস্টবেঙ্গলের হয়ে যেবার প্রথম মোহনবাগানের বিপক্ষে খেলতে নামি, তখন আমার মনে একটা দোলানি আসা স্বাভাবিক। এসেও ছিল। সহ খেলোয়াড় ও ক্লাব কর্মকর্তারা বলেছিলেন—তোমায় আজ খেলতেই হবে, সব ভুলে গিয়ে। শঙ্কর মালী বলেছিল—বাবু, আপনি এসেছেন আজ কিন্তু ওদের হারাতেই হবে। এবং হারিয়েও ছিলাম।

দুদলে খেলার সূত্রে এ ধরনের নানা স্মৃতি জমে রয়েছে মনে, অবসরে এখন সেই দিনগুলোর কথাই ভাবি।

লিগে তিন প্রধান

ইস্টবেঙ্গল—২ : উয়াড়ি—০

(দেবরাজ ও সাবির)

উয়াড়ি ডিফেন্স একদম দুর্বল পেয়ে ইস্টবেঙ্গল দাপিয়ে খেলল এবং দুই গোলে জিতল। সুরজিত, সাবির ও মিহির ক্রমাগত বেটাল করেছিল উয়াড়ি খেলোয়াড়দের কিন্তু গোল পায়নি। মাঝ মাঠ থেকে বারবার সুন্দরভাবে ধেয়ে এসেও গোলমুখে পৌঁছে তারা বিশ্রীভাবে সুযোগগুলো নষ্ট করেছে।

প্রথম মিনিটেই দেবরাজ সুন্দর একটা গোল করে। কিক অফের পরেই প্রশান্ত মাঝ মাঠ থেকে ব্যাক পাস করল বাঁ দিকের লাইনের কাছে। সত্যজিত ওভারল্যাপ করে বল ঠেলল আবার প্রশান্তকে। প্রশান্ত থেকে মিহির এবং পরে সাবিরের কাছে বল পৌঁছালো বিনা বাধায়। এবং তাই থেকে পেনাল্টি বক্সে উঠে যাওয়া দেবরাজের পায়ে বল পৌঁছতেই চকিতের জোরালো সটে গোল। স্টপার বিশ্বজিত সাবিরকে ধাওয়া করেছিল দেবরাজকে ফাঁকায় রেখে। এই গোলটা ছাড়াও দেবরাজ ওই দিন খেলেছে আগাগোড়া অদ্ভুত ভালো।

মিহির বরাবরই খাটিয়ে প্লেয়ার। সেদিন আরো বেশী ঘাম ঝরিয়েছে, উপর-নীচ ক্রমাগত উঠে-নেমে খেলে। সাবির আগের ম্যাচগুলোর তুলনায় ছিল একটু নিষ্প্রভ। গ্যালারি থেকে বাহবা ধ্বনি উঠেছে যখনই সুরজিত তার শরীরের মোচড়ে দুই/তিন জনকে ফাঁকি দিয়ে ডিফেন্স ভেদ করছিল। আর এই ব্যাপারটা গোটা খেলায় হরদম উপভোগ করতে পেরেছিল সেদিন দর্শকরা। সুভাষের বদলী নেমে মাত্র পঁচিশ মিনিট খেলে ডেভিড তেমন কিছু দেখাতে পারেনি।

ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সকে বরাবর আঁটোসাঁটো রেখেছিল চিন্ময়, সত্যজিত, মনোরঞ্জন এবং সঙ্গে গুরদেবও, তাইতেই একবারও গুছিয়ে আক্রমণ করতে পারেনি উয়াড়ি ফরোয়ার্ডরা।

প্রথম গোলটির এক মিনিট বাদেই আবার গোল। দেবরাজ ঝটিতি বল দিতেই সুরজিত রাইট ব্যাক পঙ্কজকে ডজ করে গোল মুখে ক্রস পাস দেয় সাবিরকে। সাবির শুধু বল ঠেলে দেয় দ্বিতীয় পোস্টের ধার ঘেঁষে। গোলকিপার তরুণ ছিল প্রথম পোস্টের কাছে।

মাত্র তিন মিনিটেই দু'গোল হয়ে যাওয়ায় ইস্টবেঙ্গল দাপিয়ে খেলেছে, সুন্দর বোঝাপড়ায় আক্রমণ করেছে এবং গোলে সট নিয়েছে ভালো ভালো। কিন্তু গোল সংখ্যা বাড়েনি। বলে রাখি এই উয়াড়ি গতবার লিগে হারিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলকে ১—০-য় উত্তম চক্রবর্তীর গোলে।

ইস্টবেঙ্গল : ভাস্কর, চিন্ময়, মনোরঞ্জন, গুরদেব ও সত্যজিত, প্রশান্ত ও দেবরাজ, সুরজিত, মিহির, সাবির ও সুভাষ (ডেভিড)।

উয়াড়ি : তরুণ সরকার, পঙ্কজ ঘোষ (দেবাশীষ দাশগুপ্ত), বিশ্বজিত বেরা, বিদ্যুৎ কুণ্ডু ও তুষার চক্রবর্তী, প্রদীপ সামন্ত ও তপন দাস, অলোক সেনগুপ্ত, উত্তম চক্রবর্তী, শ্যামল ভট্টাচার্য ও অমিতাভ মুখার্জি।

রেফারি : জগদীশ পাল।

মরশুমের প্রথম প্রদর্শনী—মোহনবাগান : জর্জ। পায়াসের দ্বিতীয় গোল দেখছে জর্জের ব্যর্থ সৈনিক বিশ্বজিৎ, অনিরুদ্ধ সঞ্জীব, রতন ও বিভু / অরুণ



মোহনবাগান-২ ঃ জর্জ টেলিগ্রাফ-০
(পায়াস)

১৬ জুন ঃ জেভিয়ার পায়াসের দেওয়া দুই গোলে মোহনবাগান জয় পেল জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে। আগের ম্যাচগুলোর মতোই কোনো চিত্তাকর্ষক ঘটনা সেদিন মোহনবাগানের খেলায় ছিল না। একেবারে মামুলি খেলা। গোল দুটিও অতি সাধারণ। মানস এবং বিদেশের ঝড়ের বেগে কয়েকটি আক্রমণ, গৌতম ও কম্পটনের চমৎকারিত্বে ভরা কিছু জারিজুরি ছাড়া মোহনবাগান খেলোয়াড়দের তেমন কোনো দাপট ছিল না।

অথচ শক্তির তুল্যমূল্যে জর্জ ছিল অত্যন্ত সাধারণ প্রতিপক্ষ। সেই ম্যাচটির আগে পর্যন্ত গতবছরের চতুর্থ স্থান পাওয়া জর্জের শক্তির কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। আটটা ম্যাচে তারা একটিতে মাত্র জয়ী হয়েছিল।

তবুও মোহনবাগান বড় ব্যবধানে জয় তো পেলই না, সামগ্রিকভাবে খেলাটায় আধিপত্য থাকলেও মুন্সিয়ানা ছিল না। বরং থেকে থেকে জর্জের কয়েকবারের হানা বিপদ ডেকে এনেছিল প্রায়। দ্বিতীয়ার্ধের ২০ মিনিটে মুনিশ মান্নার ফ্ল্যাগ কিক থেকে গোলমুখে জটলার সৃষ্টি হয়। এবং তাই থেকে দু'বার সুব্রত অধিকারী হেড দেয়। দ্বিতীয়বার একদম গোল লাইন থেকে হেডে ফেরায় প্রদীপ। দুই অর্ধেই একটি করে দুর্দান্ত সট মোহনবাগান গোলের দিকে ধাবিত হয় ডেনিস উইলিয়ামসনের পা থেকে। প্রতাপ দুটোকেই ধরে ফেলে সময় মত।

গত মরশুমের লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সব খেলায় জয়ের রেকর্ডটি স্থাপন করতে পারেনি জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে ১—১ ড্র করায়। এবারে কি জর্জ-ভীতির জন্যই গোড়া থেকে খেলাটায় এমন গা আলগাভাব এবং ফাউলের মাত্রাধিক্য চোখে পড়েছে? সুব্রতর হঠাৎ রমেন ভট্টাচার্যকে লাথি মারা এবং পরে ওকে কার্ড দেখাতে অন্য খেলোয়াড়দের রেফারিকে অনুরোধ করার ব্যাপারটা ছাড়াও দু' পক্ষই অবৈধভাবে খেলায় মশগুল ছিল। রেফারি মিলন দত্তের পরিচালনা ছিল দৃষ্টিকটু।

সব মিলিয়ে ফুটবল লিগের প্রথম 'প্রদর্শনী' ম্যাচটি সবাইকে হতাশ করেছে, বড় খেলার তেমন কোনো জমরমা ছিল না বলেই।

মোহনবাগান প্রথম গোল পায় পঁচিশ মিনিট বাদে। মাপা সেণ্টার পাঠায় কম্পটন প্রথম পোস্টে ঘেঁষা মানসের কাছে। মানস তৈরি হতেই বিশ্বজিত ছুটে আসে এবং হাত দিয়ে বল সামনে ফেরায়। মানস ও বিশ্বজিত একই সঙ্গে মাটিতে পড়ে। ফাঁকা গোলে বল ঢোকায় পায়াস। গোল শেষে বিশ্বজিত এবং অনায়া রেফারির কাছে প্রতিবাদ করে। কিন্তু মানস ধরে রেখেছিল বিশ্বজিতকে—এই যুক্তি রেফারি খারিজ করে দেন।

তের মিনিট বাদে দ্বিতীয় গোল হয়। বিদেশের ফ্ল্যাগ কিক পেয়ে শ্যাম ব্যাক হেড করে এবং ফাঁকায় দাঁড়ানো পায়াস শুধু ঠেলে দেয় গোলে।

শেষ আট মিনিট পায়াসের বদলী খেলে তপন কোনো বিক্রম দেখাতে পারেনি।

মোহনবাগান ঃ প্রতাপ ঘোষ, কম্পটন দত্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী ও শ্যামল ব্যানার্জি ; গৌতম সরকার ও প্রসূন ব্যানার্জি ; মানস ভট্টাচার্য, শ্যাম থাপা, জেভিয়ার পায়াস (তপন দাস) ও বিদেশ বসু।

জর্জ টেলিগ্রাফ ঃ বিশ্বজিত দাস, অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি, বিভু চক্রবর্তী, রমেন ভট্টাচার্য ও সঞ্জীব চৌধুরী ; রতন দত্ত ও সুব্রত অধিকারী ; মুনীশ মান্না, ডেনিস উইলিয়ামসন, বিভাস সরকার ও মহম্মদ মুকিম।

রেফারি ঃ মিলন দত্ত।

ইস্টবেঙ্গল-১ ঃ কালিঘাট-০
(সুরজিত)

১৯ জুন ঃ ছাপ্পান্ন মিনিট অনেক কসরতের পর ইস্টবেঙ্গল এক গোলে জয় পেল কালিঘাটের বিরুদ্ধে। সারা খেলায় এই একটি গাল পেতে ইস্টবেঙ্গল প্লেয়ারদের নাজেহাল করেছে কালিঘাট ডিফেণ্ডাররা। ৪-২-৪ পদ্ধতিতে দাঁড়ালেও কিক অফের পরে পরেই ছয়জন সতর্ক থেকেছে ডিফেন্স আগলাতে। গোটা রক্ষণ এলাকা জমাট করে মাঝে মাঝে বিপক্ষ গোলেও হানা দিয়েছিল কালিঘাট প্লেয়াররা।

প্রথমেই তারা গোল পেত (চার মিনিট) যদি ভাস্কর বাটিতে সুজিতের থেকে ছিটকে আসা লম্বা উঁচু সটটা আঙুলে ঠেকিয়ে না বাঁচাতো।

শেষ মিনিটেও কালিঘাট মস্ত সুযোগ করে নিয়েছিল। সনাতনের স্কোয়ার পাস ধরে একদম পেনাল্টি বক্সের মাঝখানে এগিয়েও একা ভাস্করকে পেয়ে সুভাষ সট নিতে ইতস্তত করায় চিন্ময় দ্রুত ছুটে বল কেড়ে নিয়ে বিপদ কাটায়।

ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ডরা গোলে সট নিতে যত না ব্যর্থ হয়েছে, তার থেকে বেশীবার ভালো ভালো ডাইভ, সময়মতো পাঞ্চসহযোগে বল রুখে বা ধরে বিক্রম দেখিয়েছে গোলকিপার প্রশান্ত। গোড়ায় সুরজিতের সঙ্গে ভালো সহযোগিতায় ঘনঘন আক্রমণের দায়িত্বে ছিল সাজ্জাদ। মিনিট কুড়ি বাদে সাজ্জাদ কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে যায় এবং ওর বদলী নামে ডেভিড ছাব্বিশ মিনিটের মাথায়। ডেভিড ও মিহির শেষ মিনিট পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে কিন্তু গোল করার মতো ফুরসত করে নিতে পারেনি এবং অন্যদের সঙ্গে সমঝোতাও ছিল না।

সুরজিত এবং সাবির ছিল সর্বদাই ভয়ঙ্কর। ওদের ডিফেন্স চিরতে বার বার সাহায্য করেছে চিন্ময় ও দেবরাজ। কর্ণাটকি এই ছেলেটি এ মরশুমেই কলকাতা মাঠে সুনাম পাবে। গোলের কিছু পরেই ডেভিডের সেণ্টার ঠিক কপাল ছোঁয়া হাইটে পেয়েও মিহির বল মাথায় সংযোগ ঘটাতে পারেনি। প্রশান্ত পাঞ্চ করলে ফিরতি বলে ওত পেতে থাকা দেবরাজ ভয়ঙ্কর জোরালো সট নেয়। কিন্তু বল ধাক্কা খায় পোস্টে।

নিষ্ফলা প্রথমার্ধ শেষে সুরজিতের স্পট কিক ছোটে গোলমুখে। সাবির সময়মতো হেড দিলেও প্রশান্ত চকিতে ফিস্ট করে কর্নারের বিনিময়ে। সুরজিতের ফ্ল্যাগ কিক আবার উড়ে এসে পড়ে সাবিরের মাথায়। সাবিরকে কিছুমাত্র সুবিধা না দিয়ে ছোঁ মেরে বল তুলে নেয় প্রশান্ত।

গোলের আগের মিনিটেও সুরজিতের লব পৌঁছেছিল পেনাল্টি বক্সে অপেক্ষমান সাবিরের কাছে। তীর বেগে প্রায় দশ গজ এগিয়ে প্রশান্ত বল হাতে তুলে নেয় সময়মতো।

প্রশান্তর কাছ থেকে বল পেয়ে সাবির ছুটে যায় প্রায় গোল লাইনের কাছাকাছি। ওখান থেকে ব্যাক সেণ্টার পাঠালে সুরজিত ফাঁকা গোলে বল ঠেলে প্রশান্তকে প্রথম পোস্টে ফেলে রেখেই (১—০)।

ইস্টবেঙ্গল ঃ ভাস্কর গাঙ্গুলি, চিন্ময় চ্যাটার্জি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গুরুদেব সিং ও সত্যজিত মিত্র, প্রশান্ত ব্যানার্জি ও দেবরাজ, সুরজিত সেনগুপ্ত, মিহির বসু, সাবির আলি ও মীর সাজ্জাদ (ডেভিড উইলিয়মস)।

কালিঘাট ঃ প্রশান্ত নন্দী, ইন্দ্রবীর সেন (দিলীপ দাস), কাঞ্চন সেন, বাসু চৌধুরী ও রণজিত চ্যাটার্জি, সমীর ফণি ও সুজিত দাস, স্বপন মিত্র, সনাতন চৌধুরী, সুভাষ মোদক ও বিদ্যুত চক্রবর্তী (মহম্মদ জলিল)।

রেফারি ঃ তারক সেন।

মোহনবাগান-৩ ঃ
(মানস, সুব্রত ও শ্যাম)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন-০

বারোটা ম্যাচ খেলে যারা একটাতেও জয়ী হতে পারেনি সেই স্পোর্টিং ইউনিয়ন চৌষট্টি মিনিট রুখে দিয়েছিল মোহনবাগানকে। শেষ ছয় মিনিটে তিন তিনটি গোল পেল মোহনবাগান মানস, সুব্রত ও শ্যাম মারফতে।

গোড়ার ম্যাচগুলোতে যেমন দাপিয়ে খেলেছিল মোহনবাগান ফরোয়ার্ডরা সেইসব কৌশল আর পরখ করা যায়নি শেষ তিনটে ম্যাচে। পুলিশ এবং জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে দুই স্ট্রাইকার—পায়াস ও তপন নিষ্প্রভ ➝



কালীঘাটের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছে যে কোন টিমের ভয়ের কারণ সুরজিত


এবার বোর্নভিটা অলিম্পিক পানীয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে
Olympic-80
MOSCOW
আপনার প্রিয় বোর্নভিটা ১৯৮০-র মস্কো অলিম্পিকের ব্যবস্থাপক সমিতির তরফ থেকে ভারতের অলিম্পিক পানীয় আহার হিসেবে মনোনীত হওয়ার সম্মান লাভ করেছে।
বোর্নভিটা ১৯৮০-র ভারতীয় অলিম্পিক দলের "অনুমোদিত সরবরাহকারী" হিসেবেও যোগ্যতা লাভ করেছে।
বোর্নভিটা কেন ?
কারণ বোনভিটা কোকো, মল্ট, দুধ আর চিনির সমস্ত পুষ্টিগুণে ভরপুর।
এক কাপ গরম দুধে দু চায়ের চামচ দিয়ে এক সুস্বাদু পানীয় তৈরী করুন।
আপনার ছেলেমেয়েদের রোজই বোর্নভিটা খাওয়ান, দিনে দুবার ক'রে। তাদের স্বাস্থ্য ঝলমল প্রাণোচ্ছল থাকার জন্যে যে পুষ্টিগুণ দরকার এটি তা যোগাতে সাহায্য করবে। আর এটি আপনারও দরকার...ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে।
ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা
প্রাণোচ্ছল জীবনের জন্যে!
Save 75 Paise
Cadbury's
Bournvita
For Extra Energy Extra Taste
500 g net
OBM/2927-

ভূমিকায় ছিল।

শেষ ম্যাচে স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে মানস ও বিদেশের অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও দুই স্ট্রাইকারই গোলমুখে গিয়ে চরম ব্যর্থতা দেখিয়েছে। অথচ স্পোর্টিং খেলোয়াড়দের পা থেকে একটাও বল যায়নি এ মরশুমে প্রথম খেলতে নামা গোলকিপার শিবাজীর হাতে। একবার বিপদ ডেকে এনেছিল কম্পটন। ব্যাক পাস করেছিল সে শিবাজীকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় রাইট আউট অজয়। শুধুমাত্র বলে পা ছোঁয়ালেই গোল লাইন পার হতে পারে এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে ঝটিতি বল তুলে নেয় শিবাজী।

স্পোর্টিং গোলকিপার সঞ্জয় ছাড়াও দুই ব্যাক সুবীর ও দীপ্তেন শেষ সময় পর্যন্ত সতর্ক ভূমিকা নিয়েছিল মোহনবাগান ফরোয়ার্ডদের রুখতে। বহু সময় স্পোর্টিং রক্ষণ আগলাতে ব্যস্ত ছিল ওদের আটজন প্লেয়ার এবং তাইতে গোলমুখে এসে পরিষ্কার খেলাতে বাধা পেয়েছে মোহনবাগান ফরোয়ার্ডরা।

এদিকে প্রথম কুড়ি মিনিট গোল না পাওয়ায় শ্যামল বারবার ওভারল্যাপে উঠে এসে বল যোগান দিয়েছে ফরোয়ার্ডরদের। প্রথমদিন খেলেই স্টপার সমীর আস্থার পরিচয় রেখেছে।

মিনিট পনের খেলার পরই মোহনবাগান তেড়েফুঁড়ে ধেয়ে যায় স্পোর্টিং রক্ষণে। বাঁদিক থেকে মানস ঝড়ের গতিতে দু'জন ডিফেণ্ডারকে ফাঁকি দিয়ে সেণ্টার করে অপেক্ষমান পায়াস ও তপনের মাঝে। তপন পেনাল্টি বক্সের মাঝ থেকে বিশ্রীভাবে কোণাকুণি শটে বলটি পোস্টের অনেক দূর দিয়ে বাইরে পাঠায়। দু'মিনিট বাদেই বক্সের মাথা থেকে একা গোলকিপার থাকা সত্ত্বেও বিদেশের সট বাইরে চলে যায়। গৌতমের লম্বা লব থেকে পাঁচ গজ দূরের বল তপন সট নেয় এবং তা গোলকিপারের পায়ে লেগে ফিরে আসে।

মোহনবাগানের সব ফরোয়ার্ডই যখন গোল পেতে ব্যর্থ হয়, তখন (২৮ মিনিট) মানসও সুযোগ হারায় গোল লাইন থেকে পায়াসের ব্যাক পাস দেওয়া বল বারের উপর দিয়ে মেরে। দু'মিনিট বাদেই গোলমুখের এক জটলা থেকে শ্যামলের হেড গোল লাইন থেকে ফিরিয়ে দেয় দীপ্তেন।

আটচল্লিশ মিনিট বাদে তপনের পরিবর্ত নামে প্রদীপ। সুব্রত হয়ে যায় মোহনবাগানের স্ট্রাইকার। ছয় মিনিট বাদে শ্যামও নামে পায়াসের বদলে। তবে খেলার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

স্ট্রাইকার সুব্রত একদম গোলমুখ থেকে বারের উপর বল তুলে দেয় মানসের মাপা সেণ্টার পেয়েও। পরে পরেই বিদেশের কাছ থেকে বল পেয়ে সুব্রত একা গোল পেয়েও বল ঠেলে আলতোভাবে, এবং তা সহজেই হাতে তুলে নেয় সঞ্জয়।

মোহনবাগান প্রথম গোল পায় মানসের দ্বারা। গৌতমের লম্বা লব পৌঁছয় সুব্রতর কাছে। গোল লাইন ধরে ছুটে আসা মানস চকিতে সেটি হেড দেয় (১-০)। তিন মিনিট বাদেই শ্যামের ফরোয়ার্ড পাস থেকে সুব্রত শুধু আলতোভাবে ফাঁকা গোলে বল ঠেলে (২-০)। শেষ বাঁশী বাজার এক মিনিট আগে বিদেশের উঁচু লব সুব্রত ফলস দেয় শ্যামের উদ্দেশ্যে এবং শ্যাম তাতে গোল করতে ভুল করেনি (৩-০)।

মোহনবাগান ঃ শিবাজী ব্যানার্জি, কম্পটন দত্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য, সমীর ভট্টাচার্য ও শ্যামল ব্যানার্জি, গৌতম সরকাব ও প্রসূন ব্যানার্জি, মানস ভট্টাচার্য, তপন দাস (প্রদীপ চৌধুরী), জেভিয়ার পায়াস (শ্যাম থাপা) ও বিদেশ বসু।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন ঃ সঞ্জয় ব্যানার্জি, সুবীর লাহিড়ী, সুব্রত গুহ, নিশীথ শ্রীমানি ও দীপ্তেন ভৌমিক, পরিমল দাস ও শম্ভু মিত্র, অজয় চ্যাটার্জি, সুব্রত সরকার, কার্তিক চৌধুরী ও রথীন দত্ত।

রেফারি ঃ জগদীশ পাল।

মহঃস্পোর্টিং-১ ঃ বি এন আর-০

(সুভাষ রায়)

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বছর বছর কলকাতার প্রথম ডিভিসন ফুটবল লিগে সব ছোট দলের যে অভিজ্ঞতা হয় ২১ জুন মহমেডানের বিপক্ষে বি এন রেলওয়ে দলের এগারোজন খেলোয়াড় একই অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের এগারোজন ছাড়াও দর্শকঠাসা গ্যালারির বিপক্ষে বি এন আর-এর এগারোজনকে লড়াই করতে হল সারাক্ষণ।

সাত মিনিটের মধ্যেই মহমেডানের লতিফুদ্দীনের কর্নার থেকে উড়ে আসা বলের ফ্লাইট বুঝতে কুনাল মুখার্জি ভুল করল এবং খেলার একমাত্র গোলটি সুভাষ রায় হেড থেকে পেল। এর আগে বি এন আর ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের কাছে অনেক বেশী গোলে পর্যুদস্ত হয়েছে। কাজেই মহমেডান আরও গোল করবে এই রকম একটা ধারণা করা ভুল ছিল না।

কিন্তু বি এন আর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলে এবং কমপক্ষে তিনটি গোল করার সহজ সুযোগ নষ্ট করে। স্ট্রাইকার কিশোরী দাস অনেক সময় এবং ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে জোরালো সটে গোলের দিকে বল পাঠাতে ব্যর্থ হয়। এরপর মহমেডানের ব্যাক মুস্তাফা লিংকম্যান দীপক চ্যাটার্জির আচম্বিতে করা সট গোল লাইনে দাঁড়িয়ে হেড করে ফিরিয়ে দেয়। দ্বিতীয় অর্ধে অভিজ্ঞ চেম্মা রেড্ডী বক্সের মধ্যে কিশোরীর দেওয়া উঁচু বল অহেতুক মাথা নীচু করে সহ খেলোয়াড় গৌতম বক্সীর জন্য ছাড়লে সবচেয়ে ভাল গোল করার সুযোগ হাতছাড়া হয়। প্রথমার্ধে একইভাবে চেম্মা সজল দাসের ভাল সেণ্টার কাজে লাগাতে পারে না।

বি এন আর-এর খেলায় আক্রমণের ধার যেমন ছিল, তেমনি শক্তিশালী মহমেডানের আক্রমণ প্রতিহত করে বেশী সময় খেলা এবং বল নিজেদের আয়ত্তে রাখে।

মহমেডান অবশ্যই আরও একটি গোল থেকে বঞ্চিত হয় যখন পরিবর্ত খেলোয়াড় অমলরাজের তীব্র সট বারের ভেতরে লেগে গোল লাইনের ওপর আছড়ে পড়ে। কিন্তু গোল লাইন যে জমির ওপর টাল হয়েছে সেটা সমান ছিল না (হাওড়া ইউনিয়নের দিকে) এবং বল মাটিতে পড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে। ৬২ মিনিটের সময় এই ঘটনা। এর আগে লতিফুদ্দীনের ভাই পরিবর্ত খেলোয়াড় সুজাত বক্সের মধ্যে দাঁড়িয়ে গোলের অনেক দূর দিয়ে ভলি মারে। সমরেশ চৌধুরীও একবার দূর থেকে সট মেরে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

মহমেডান স্পোর্টিং ঃ নাসির আমেদ, প্রেমনাথ ফিলিপস, মহিদুল ইসলাম, অশোক চক্রবর্তী, মুস্তাফা, সমরেশ চৌধুরী, খাবাজী, (অমলরাজ), লতিফুদ্দীন, নাজিব, (সুজাত), হাবিব ও সুভাষ রায়।

বি এন আর ঃ কুনাল মুখার্জি, আর রহমান, বিপ্লব মজুমদার, সুদীপ চ্যাটার্জি ও অমিত দাশগুপ্ত, দীপক চ্যাটার্জি, (সুভাষ বসু), গৌতম বক্সী, সজল দাস, কিশোরী দাস, চেম্মা রেড্ডী ও মানিক ভৌমিক (প্রদীপ প্রামানিক)।

রেফারি ঃ রবি চক্রবর্তী।

খেলার আসর

পরবর্তী সংখ্যা 'খেলার আসর' বেরোবে ১৩ জুলাই। থাকছে ৭ জুলাই ম্যাচের বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট এবং ছবির অ্যালবাম—যা এদেশের কোন পত্র-পত্রিকায় পাবেন না



আমার সংসারে রোজগেরে দু'জন
আমার স্বামী এবং আমার ব্যাঙ্ক



আমাকে আপনি ভাগ্যবতী বলতেই পারেন।

আজ থেকে পাঁচ বছর আগে বাবার কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা পেয়েছিলাম—ভাগ্যের শুরু সেদিন থেকেই।

আমার স্বামীর পরামর্শমতো সেই টাকা ইউকোব্যাঙ্ক-এর ডিপোজিট সার্টিফিকেট স্কীমে জমা করে দিয়েছিলাম।

সেদিন থেকে আমার সংসারে বাড়তি রোজগারের সূত্রপাত।

ইউকোব্যাঙ্ক-এর দৌলতে আমার সেই টাকা প্রতি বছরই একটু একটু করে বেড়ে চলেছে।

একদিন আমিও এই টাকা তুলে দেবো আমার মেয়ের হাতে।

আমার এতদিনের সঞ্চয় সেদিনই সার্থক হয়ে উঠবে।

ইউকোব্যাঙ্ক-এর
লাভজনক জমা প্রকল্প

সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট স্কীম
ফিক্সড ডিপোজিট স্কীম
ডিপোজিট সার্টিফিকেট স্কীম
রিকারিং ডিপোজিট স্কীম
গ্রো ইওর মানি স্কীম (কুবের যোজনা)
টাইনি সেভিং স্কীম (লঘু বচৎ যোজনা)
ম্যান্থলি পেনশন স্কীম

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

UCO/CAS-38/79 BEN

নিউজিল্যাণ্ডকে হারানো অসম্ভব ছিল না

লিডস থেকে সুব্রত সরকার

ডাক বিভাগের গোলমালে এই লেখা কবে পৌঁছবে জানিনা। সারা ব্রিটেন জুড়ে নানারকম ধর্মঘট, কাজের টাল-বাহানা ইত্যাদি চলেছে। জিনিসপত্রের দাম দু' বছরে শতকরা পঞ্চাশভাগ বেড়েছে।

১৩ জুন লিডসে বৃষ্টি হওয়ার ফলে প্রুডেনশিয়াল কাপের দুটি খেলাই বন্ধ হয়েছিল। পরে শুরু হলে ভারতকে তার ফল ভোগ করতে হয়, অর্থাৎ নিউজিল্যাণ্ডের কাছে হেডিংলে মাঠে পরাজয়।

এখনকার ক্রিকেট সমালোচকরা ভারতের জয় সম্পর্কে অবশ্য কোন আশা করেননি। কিন্তু আমার নিশ্চিতভাবেই মনে হয়েছে যে ভারতের পক্ষে নিউজিল্যাণ্ডকে হারানো একেবারে অসম্ভব ছিল না। এবং তাহলে সেমিফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

দুটি ঘটনা ভারতের জয়ের অন্তরাল হয়ে দাঁড়ায়। টসে হেরে আগে ব্যাট করতে বাধ্য হয়। আবহাওয়া খুবই খারাপ ছিল। পিচও ছিল স্যাঁতস্যাঁতে। আর দ্বিতীয় কারণ হল চিরাচরিত প্রথায় শালা ও ভগ্নীপতির একই সঙ্গে ব্যাটিং সাফল্য না পাওয়া। খুব কম ম্যাচেই দুজনে একসঙ্গে ভাল খেলেছেন।

আরও একটা কারণ হল নিউজিল্যাণ্ড যখন ২ উইকেটে ১০৩ রান করেছে, তখন গ্লেন টার্নার পরপর দুবার আউট হওয়া থেকে অব্যাহতি পায়। এবং উভয় ক্ষেত্রেই বেঙ্কট-রাঘবন ছিলেন বোলার। উইকেটকিপার সুরীন্দর খান্না লেগ সাইডে স্ট্যাম্প করার সুযোগ নষ্ট করেন। টার্নার তখন মাত্র ৩ রান করেছেন। এর পরের ওভারে কপিলদেব মিড উইকেটে টার্নারকে ফেলে দেন।

গাভাসকর ভারতের পক্ষে সবচেয়ে বেশী রান করলেও ব্যাটিং ভাল হয়নি। বিশেষ করে যখন বার্মিংহ্যামে বিশ্বনাথের ব্যাটিং-এর কথা মনে পড়ে যায়। সুনীল শুরুতেই রিচার্ড হ্যাডলির বলে কট এণ্ড বোল্ড আউট হচ্ছিলেন। এরপর তার খেলার ধরন একেবারে স্তিমিত হয়ে যায়। শুধু ব্রিজেশ এসে যখন মারতে শুরু করেন তখনই গাভাসকরের খেলায় কিছুটা গতি সঞ্চার হয়।

নিউজিল্যাণ্ড দলের ন্যাটা ব্যাটসম্যান ব্রুশ এডগারের অপরাজিত ৮৪ রান ছিল অনবদ্য এবং 'ম্যান অব দি ম্যাচ' পুরস্কার পান। বোলারদের মধ্যে লংহেয়ারাডি ব্রায়ান ম্যাকেনিক ২৪ রানে ৩টি উইকেট পান।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে খেলার মত ভারতকে মেঘলাদিনে ব্যাট করতে হয়। নিউজিল্যাণ্ডকে ওই অসুবিধে ভোগ করতে হয়নি। এমনকি উইকেট পর্যন্ত পেস বোলারদের সাহায্য করেনি।

ব্যাটিং-এর সময় প্রথম গায়কোয়াড় হ্যাডলির বলে আউট হন। বলটি খুব দেরিতে সুইং করে। দিলীপ বেঙ্গসরকর উইকেটের বাইরে দেওয়া বল মারতে গিয়ে ব্যর্থ হন এবং বিশ্বনাথ নিজের খেলা বিশেষ যত্ন নেননি বলে মনে হয়েছে। মহীন্দর আউট হন ব্যাট ও প্যাডের মাঝখান দিয়ে বল গলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

কপিল প্রথমে ভাল খেললেও ফাস্ট বোলারদের বিপক্ষে ব্যর্থ হন। ল্যান্স কেয়ারন্স কপিলকে একরকম ঠকান এবং গাভাসকর হ্যাডলির বলে উইকেটের পেছনে আউট হন।

জন রাইট ও এডগার নিউজিল্যাণ্ডের শতরানের জুটি ছিলেন ইনিংসের শুরুতে। দু'জনেই ন্যাটা ব্যাটসম্যান। এর মধ্যে রাইট ডার্বিশায়ার কাউন্টিতে খেলে অনেক রান পাচ্ছেন।

বিশ্বনাথ ৫৩ রান করে আউট হওয়ার পর ভারতের ইনিংসের যবনিকা যেমন নেমে আসে তেমনি ভারতের বোলাররাও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হলেন। এমনকি টার্নার আগে আউট হলে অবস্থার বিশেষ হেরফের হত কিনা সন্দেহ। কারণ নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাটিং-এর ঘনত্ব অনেক নীচে পর্যন্ত। অর্থাৎ নয় অথবা দশ নম্বর খেলোয়াড়ও ব্যাট করতে পারেন। ভারতের ব্যাটিং ব্যর্থতাই পরাজয়ের মূল কারণ।

ফুটবলে বাংলার মেয়েরা সবার উপরে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ফেডারেশন ফুটবল কাপের খেলা হল গত মাসে। কোয়েম্বাটুরে। অন্য ফেডারেশন—মেয়েদের। যোগ দিয়েছিল মণিপুর, কর্ণাটক, বিদর্ভ, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা ও বাংলা। নিখিল ভারত ফুটবল মহিলা ফুটবল ফেডারেশন এই প্রথম ফেডারেশন কাপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করল। প্রথম আসরেই বাজিমাত করল বাংলার মেয়েরা কর্ণাটককে দুদিনে মোট ৯ গোলে হারিয়ে। আরও বলার মত কথা বাংলা ৬টি খেলায় গোল দিয়েছে ৫০টি। বাংলার গোলে একটিও বল প্রবেশ করেনি। এরই মধ্যে ২৪টি গোল দিয়েছে একা শুক্লা দত্ত।



ফেডারেশন ফুটবল বিজয়ী বাংলার মেয়েরা

বাংলা প্রতিযোগিতায় প্রথম খেলায় গুজরাটকে হারিয়েছে ১০ গোলে, কেরালাকে ৭ গোলে, উত্তরপ্রদেশকে ১৮ গোলে, মণিপুরকে ৬ গোলে, কর্ণাটককে প্রথম পর্যায়ের ফাইনালে দিয়েছে ৪ গোল। দ্বিতীয় দিন ৫ গোল। প্রথম দিন শুক্লা দত্ত দিয়েছে ৩টি গোল, দ্বিতীয় দিন ২টি। প্রথম দিন শান্তি মল্লিক একটি গোল দিলেও দ্বিতীয় দিন সে পেয়েছে ৩টি গোল।

বিজয়ী দলের ফেরার পথে মাদুরাই-এ হল একটি প্রদর্শনী ফুটবল। প্রেসিডেন্ট একাদশ বনাম চেয়ারম্যান একাদশ। প্রেসিডেন্ট একাদশ জিতল ২-১ গোলের ব্যবধানে।

এই প্রেসিডেন্ট একাদশের স্ট্রাইকার সপ্রতিভ ফুটফুটে সপ্তদশী অনিতা সরকার সেদিন ফেডারেশন কাপ নিয়ে অনেক গল্প করল। অনিতা স্ট্রাইকার। ভাল খেলেছে কিন্তু কোয়েম্বাটুরে সব খেলায় তেমন খেলতে পারেনি। কারণ অ্যাপেণ্ডিসাইটিস। কলকাতা এসেই ও ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। ডাক্তার ওর অপারেশনের ব্যবস্থাও করেন। মন খারাপ—'আবার কবে মাঠে নামতে পারব কে জানে তবে মনের জোর থাকলে এক দেড় মাসের মধ্যেই মাঠে নামা যায় ?'

'তোমার মনের জোর কেমন ?'

'প্রচণ্ড। দেখুন না, খুব তাড়াতাড়ি মাঠে ফিরে আসব।' অনিতার সঙ্কোচহীন উত্তর।

আমি সুরজিত সেনগুপ্তর কথা তুলে বললাম ওরও একই অপারেশন হয়েছিল—কমাস আগে। এখন কোনো প্রবলেম নেই।

সম্ভবত অনিতা সুস্থ হবার আগেই মেয়েরা এক প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গে। দলের সঙ্গে না যেতে পারায় অনিতার দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য এখন এশিয়ান ফুটবল টুর্নামেন্ট। আগামী ডিসেম্বরে কালিকটে এই মহিলা আসর বসছে। উদ্যোক্তা নিখিল ভারত মহিলা ফুটবল ফেডারেশন।ওরা আশা করছে মহিলা ফুটবল যে সব দেশে হচ্ছে তারা সকলেই যোগ দেবে। ভারতের দুটি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে বলে মোটামুটি ঠিক হয়েছে।

গত তিনটি ন্যাশনালে বাংলার প্রতিনিধি অনিতার আশা—সে জাতীয় দলে সুযোগ পাবে। এর আগে জাতীয় দলের হয়ে মালয়েশিয়া সফরে গিয়েছিল অনিতা। বড়িশা থেকে সপ্তাহে তিনদিন প্র্যাকটিসে আসত, সেই প্র্যাকটিস বন্ধ। খেলার জন্যই স্কুলের গণ্ডি পার হবার পর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে। হাবিব, ইন্দার সিং ও সুরজিত ওর আদর্শ, মোহনবাগানের প্রচণ্ড ভক্ত। 'কিন্তু নিজে মাঠে না গেলে এসব নিয়ে কি আর দিন কাটান যায় ? গান শুনতে ভালবাসি তাই বা কতক্ষণ শোনা যায়।' সম্পর্কে দাদা সুশীল বসু ওর প্রধান উৎসাহদাতা, তিনিও বললেন—'সত্যি যা মেয়ে, ফুটবল ছাড়া কিছু জানে না, কি করে ওর দিন কাটবে কে জানে ?'

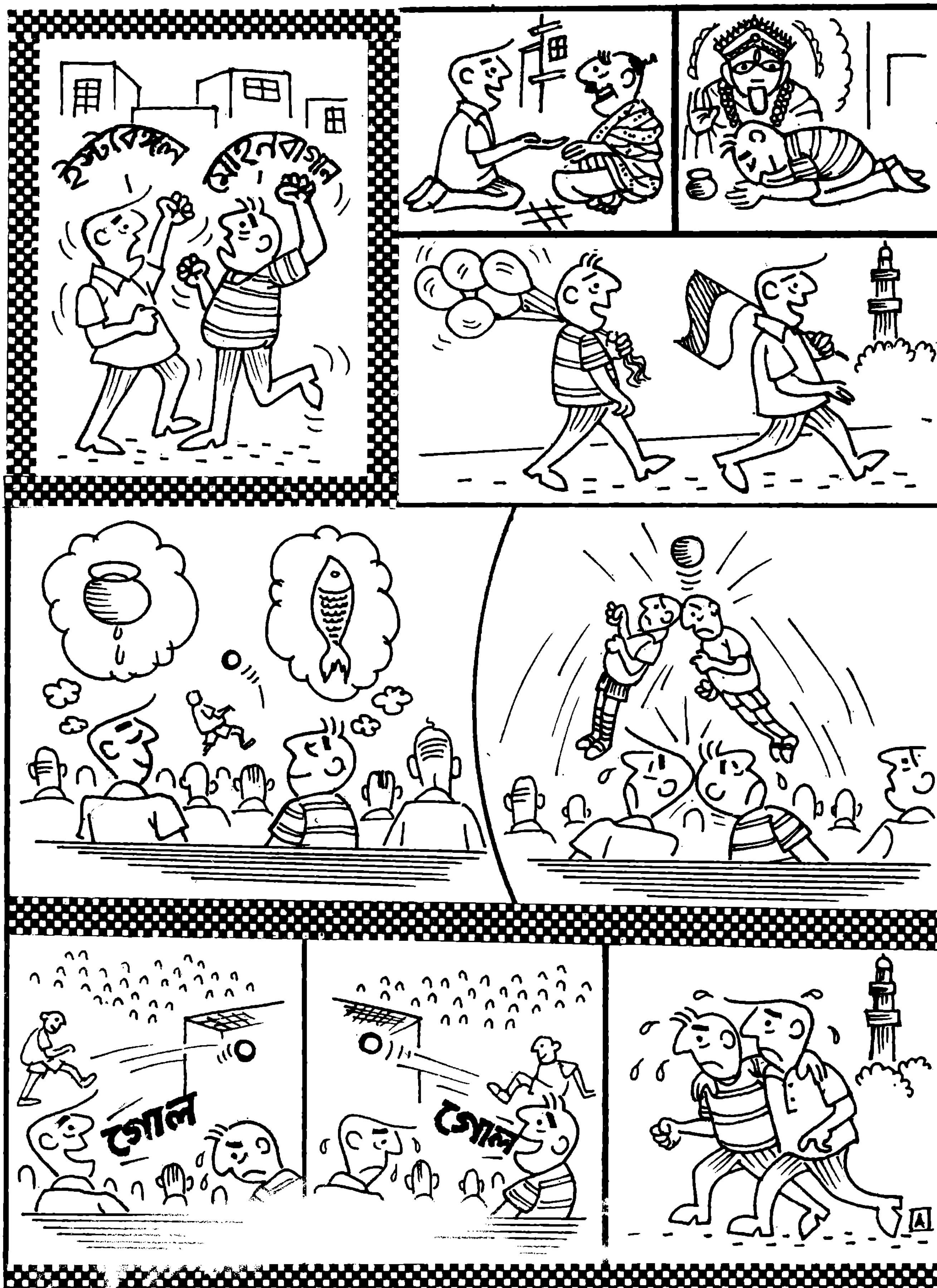
ছড়া

অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

'তিন প্রধানের' যুদ্ধ
জমেছে তো বেশ।
সবুজ মাঠের বুকেতে
উত্তেজনার রেশ ॥
যুদ্ধজয়ী কে হবে
বলা বড়োই শক্ত।
জ্যোতিষীর কাছে তাই
ছোটেন দলের ভক্ত ॥



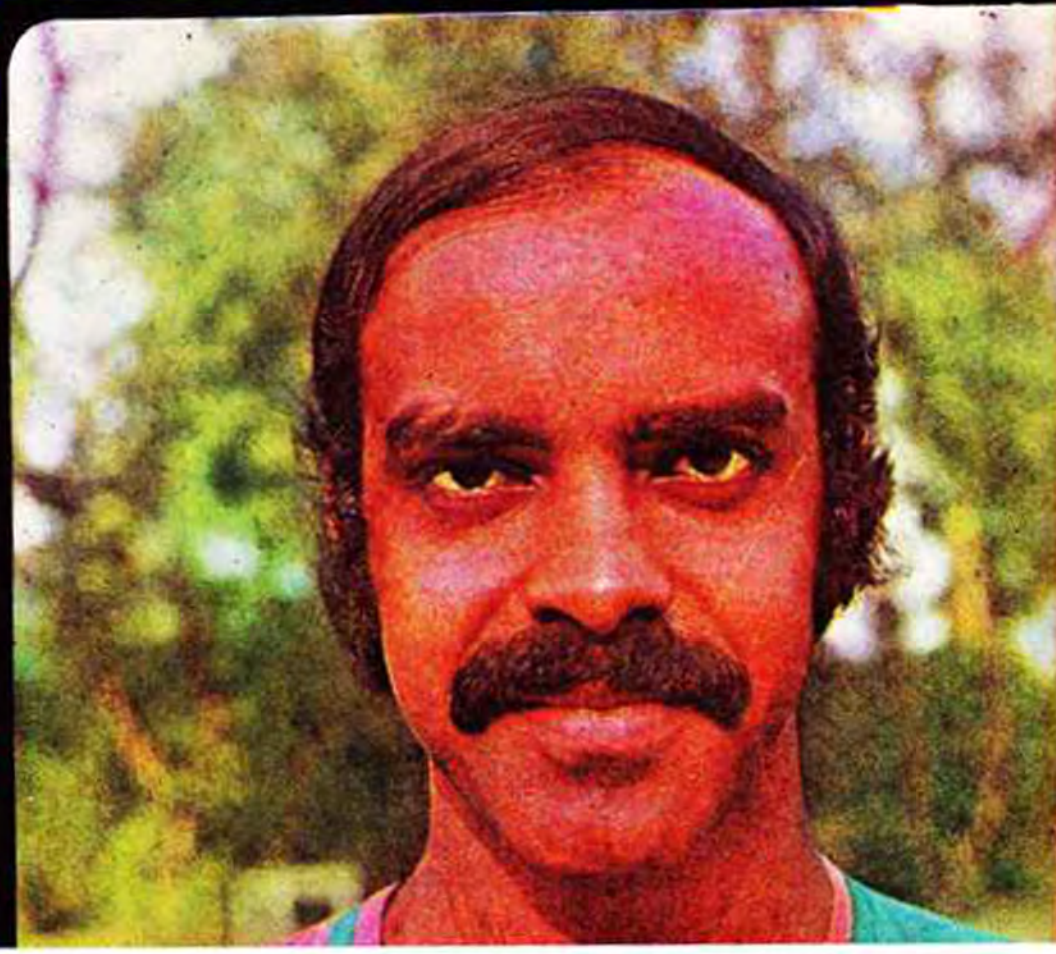
১৯৭৯ লিগে



কার্টুন ঃ আলি



মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

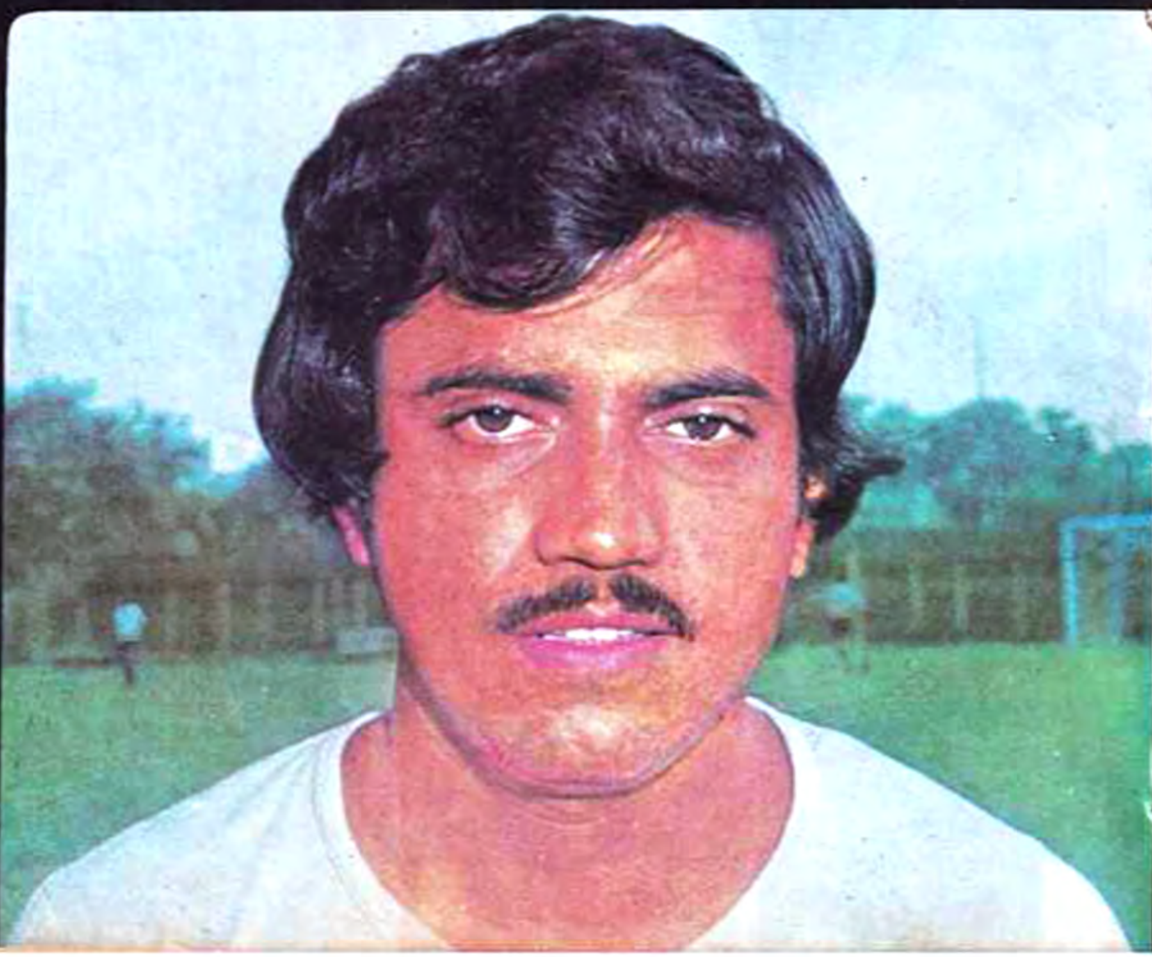


প্রদীপ চৌধুরী

ছবি • পাহাড়ী রায়চৌধুরী



সমরেশ চৌধুরী / অরুণ



লতিফুদ্দিন / তপন রায়

গত এক বছরে মোহনবাগান এবং এবার........

সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ঊনআশীর লিগ শুরু হওয়ার সময় থেকে মোহনবাগানের সামনে যে সমস্যাটি ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াতে চাইছে আটাত্তরে সেটা থেকে মোহনবাগান মুক্ত ছিল। ঠিক লিগ থেকে বললে কিছুটা ভুল বলা হবে, কারণ মোহনবাগানের অ্যাটাকিং জোনে লিডারের অভাবটা ফুটবল ট্রান্সফারের সময় থেকেই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, যার ফল মোহনবাগানকে হাতেনাতে পেতে হয়েছিল আটাত্তরের রোভার্সে। ওরকে মিলস রোভার্সের প্রথম খেলাতেই মোহনবাগানকে সারা মাঠে দাঁড় করিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে চার চারটি গোল করেছে। সেই দুঃস্বপ্নটিকেই নিত্যসঙ্গী করে মোহনবাগান ঊনআশীর লিগ শুরু করেছে। মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যায় যার ফয়সালা হবে ৭ জুলাই।

হাবিব, আকবর এবং সুভাষ আটাত্তরে মোহনবাগানকে অনেক দিয়েছে বললে কারো কারোর চোখ ট্যারা হতে পারে। তবে কথাটা সত্যি। ফরোয়ার্ড লাইনের লিডারশিপ কোনও না কোনও সময়ে ছিল ওদেরই হাতে। অন্তত সারা লিগটাই এই তিনজনের সঙ্গে পুরো দলটা হেসে খেলে নেচে কুঁদে একের পর এক গোল করে গেছে এবং লিগ শেষে ৭৯টি গোল দিয়ে সৃষ্টি করে নতুন রেকর্ড। ফরোয়ার্ড লাইনে এবছর সেই লিডারশিপ নেই। দুটো উইং ফরোয়ার্ড এবং দুটো হাফ ভাল ফর্মে থাকার সুবাদে এখনও মোহনবাগানকে গোল পেতে তেমন একটা কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে না ঠিকই, তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ে যেমন গাছপাকা আম টুপটাপ মাটিতে পড়ে তেমনভাবে গোলও কিন্তু পাচ্ছে না মোহনবাগান। গতবার কিন্তু পেয়েছিল।

গতবছর মোহনবাগান চারটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। ঘরোয়া লিগ ছাড়া শিল্ড, ডুরাণ্ড ও রোভার্স। সব মিলিয়ে সাফল্য আর দুঃস্বপ্ন ঠিক ভাগাভাগি হয়ে গেছে। অপরাজিত লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া শক্তিশালী আরারাতের সঙ্গে শিল্ড ভাগাভাগি করে কলকাতায় মোহনবাগান তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। অথচ এই প্রচণ্ড সফলতার ঠিক পরেই ডুরাণ্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে তিন তিনটি গোল হজম করতে মোহনবাগানের কষ্টই হয়েছিল। অথচ খেলা দেখে এবং খেলোয়াড়দের মুখের রিপোর্ট শুনে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, তা হল তিন গোল খাওয়ার মত জঘন্য ফুটবল মোহনবাগান খেলেনি। তবে সেটা কথা নয়। কথা হল হার হারই এবং গোলের সংখ্যাটাও নেহাতই হেলাফেলা নয়।

ডুরাণ্ড ফাইনালে হার মোহনবাগান জনতাকে কষ্ট দিয়েছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু রোভার্সে প্রথম খেলাতেই ওরকের কাছে চার গোল খাওয়া কষ্টের থেকে লজ্জা দিয়েছে বেশী। আর তার থেকেও যা বেশী তা হল অবাক হওয়া। রোভার্সের ওই ঘটনার পর সেদিন নব্বই মিনিট খেলা এক খেলোয়াড় আমায় বলেছিল, শুধু দৌড় করিয়েই ওরকে আমাদের চার গোল দিয়ে দিল। আরও হতে পারত। হয়নি, আমাদের সৌভাগ্য। কথাটা শুনে অবাক হয়েছিলাম। ও সাফাই গেয়েছিল ঃ দল বদলের জন্য দেড় মাস কোনও প্র্যাকটিস হয়নি। তার ওপর সুব্রত দলে ছিল না। সব মিলিয়ে সে এক বিদ্ঘিকিচ্ছিরি অবস্থা।

আউট অফ প্র্যাকটিস হলে অন্তত এ ক্লাশ টুর্নামেণ্টে যে ভাল খেলা যায় না সেকথা আমি জানি। তবে কয়েকটা প্রশ্ন আমায় কখনই রেহাই দেয় না। যেমন, সারা বছরই যারা ফুটবল খেলে বেড়ায় তারা একমাস আউট অফ টাচ থাকলে কতটা সাধারণ পর্যায়ে নেমে যেতে পারে? দুই, কতটা সাধারণ পর্যায়ে নামলে মোহনবাগানের পোড় খাওয়া ফুটবলাররা ওরকের মত একটা সাধারণ দলের কাছে চার গোলে হারতে পারে? এর কোনও যুতসই উত্তর আমি পাইনি তবে মোহনবাগানের অন্তত আটজন ফুটবলার আমাকে এই আশ্বাস দিয়েছে যে ডুরাণ্ড-রোভার্সের মোহনবাগানের চেয়ে ঊনআশীর লিগে মোহনবাগান অনেক আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলবে এবং লিগ জয়ের স্বপ্ন থেকে পিছু হটবে না।

সম্পাদক মশাই আমায় সেদিন বললেন ঃ লোডশেডিংয়ের দাপটে আমরা নাঙ্গা ফকির হয়ে গেছি। তাতে অবশ্য দুঃখ নেই। তবে চিন্তার ভূত চেপেছে ঘাড়ে। ঠিক সময়মত পত্রিকা বের করাটা এখন রিয়েলি একটা হেডেক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম ঃ এটা আপনার ভূমিকা, আসল উপন্যাসের সারবস্তু হল আগেভাগে লেখাটা জমা দিতে হবে। তাই তো? মিষ্টি হেসে সম্পাদকমশাই বলেছিলেন, হ্যাঁ, শনিবার। শনিবারের মধ্যেই লেখাটা জমা দিও, প্লিজ। আমি জলদি হিসেব করে নিলাম—শনিবার, তার মানে মোহনবাগান--জর্জের মধ্যে মরশুমের প্রথম প্রদর্শনী খেলা ওই দিনই। তার আগেই মাল মশলা তৈরি করে সম্পাদকের টেবিলে আমার লেখা পৌঁছে দিতে হবে। তথাস্তু।

★ ★ ★

জর্জ ম্যাচের আগে পর্যন্ত মোহনবাগান খেলেছে ছ'টি ম্যাচ, গোল পেয়েছে ১৭টি। সব থেকে কম গোল দিয়েছে প্রথম খেলায় ভ্রাতৃসংঘকে—একটি এবং সব থেকে বেশি গোল দিয়েছে বি এন আর-কে—পাঁচটি। গতবার লিগ শেষে মোহনবাগানের গোল অ্যাভারেজ ছিল চার, এবার এ পর্যন্ত তিনের কিছু কম। এবছর তেমনভাবে গোল যে পাচ্ছে না এটা স্বীকৃত। কারণ কি এবং কেমন খেলছে মোহনবাগান, একটু খতিয়ে দেখা যাক।

ফরোয়ার্ড লাইনে লিডারের অভাবটা বেশী গোল না পাওয়ার প্রধান কারণ। গৌতম যখন গতবার লিগের প্রাথমিক পর্যায়ে মাঠে নামত না, হাবিবকেই তখন মাঝ মাঠের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল। প্রধানত ফরোয়ার্ড হাবিব নিজের অভিজ্ঞতা খরচ করে



'৭৮-এর সফল কোচ পি কে অভিনন্দন গ্রহণ করছেন


সুব্রত ভট্টাচার্য

কোচ
প্রদীপ ব্যানার্জি




মানস ভট্টাচার্য



মোহনবাগান
১৯৭৯


উলাগানাথন


প্রদীপ চৌধুরী


শ্যাম থাপা


কম্পটন দত্ত


সমর ভট্টাচার্য


শিবাজী ব্যানার্জি


গৌতম সরকার


অধিনায়ক
দিলীপ পালিত
রঞ্জিত মুখার্জি
জেভিয়ার পায়াস
সন্তোষ বসু
MOHUN BAGAN ATHLETIC CLUB FOUNDED 1889
সুধীর কর্মকার
বিদেশ বসু
স্বপন নন্দী
শ্যামল ব্যানার্জি

হাফে খেলেছিল যদিও ওর দ্বারা ডিফেনসিভ কাজটা প্রায় কিছুই হয়নি বলা যায়। আক্রমণ শানাতে প্রচণ্ডভাবে উঠে যাওয়া হাবিবের পড়ে থাকা জমি দিয়ে যখন কাউন্টার অ্যাটাক হত প্রসূনকে তখন হতে হত দিশেহারা। শক্তির তারতম্যে আসমান জমিন ফারাক থাকায় ছোট দলগুলি মাঝমাঠ পেরিয়েই 'ওরে, বাবা এতদূর এসে গেছি' গোছের হাবভাব নিয়ে বল জমা দিয়ে গেছে। ফলে খিদিরপুর ম্যাচ পর্যন্ত মোহনবাগানের গোল অক্ষত ছিল। হাবিবের অ্যাটাকিং টেনডেনসির ফলে প্রসূনের খেলা চোখে পড়েনি আটান্তরের লিগের গোড়ায়। গৌতম প্রচণ্ডভাবে ফিরে আসায় সব সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে হাবিব ফরোয়ার্ড লাইনের লিডারের দায়িত্ব পালন করে যায়। এবছর অভাব ওই লিডারেরই।

মানস তপন, শ্যাম, পায়াস ও বিদেশ—এই পাঁচজনের মধ্যে থেকেই চারজনকে বেছে মোহনবাগানকে আক্রমণ শানাতে হবে। কেমন খেলছে এরা? এক এক করে বলি।

ভ্রাতৃর সঙ্গে প্রথম ম্যাচটিকে যদি ট্রায়াল ধরি তাহলে দ্বিতীয় ম্যাচটি থেকেই মানস-বিদেশ মোহনবাগানের যা কিছু আক্রমণের ধার যুগিয়ে আসছে। মানস গতবছর শিল্ড থেকে যেভাবে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে তার ধারাবাহিকতা এবছরও বজায় আছে। এখনও পর্যন্ত মানস খেলছে বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে। আউট সাইড ও ইনসাইডের ছোট ছোট ডজে এবং স্পিডে বিপক্ষ ব্যাকদের টালামাটাল করে মানস এবছর প্রায় প্রতিটি খেলাতেই একাধিক সুন্দর সেণ্টার করেছে এবং গোলও পেয়েছে বেশ কয়েকটি। বিদেশের গতি এবং বল ধরে লাইন বরাবর ছুটে হঠাৎ 'কাট' করে ভেতরে ঢোকা এখনও যে কোনও ভাল ব্যাকের পক্ষে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ পর্যন্ত বিদেশ যা খেলেছে তাতে মোহনবাগান সমর্থকদের আশাহত হওয়ার মত কিছুই ঘটেনি। মোহনবাগান জনতা অন্তত এটুকু আশা মানস ও বিদেশের ওপর করতে পারে যে তাদের নিখুঁত সেণ্টার তপন বা পায়াস বা শ্যাম ১৪ গজের ভেতরে সুন্দর রিসিভ করছে যা থেকে যখন তখন গোল আসে।

জেভিয়ার পায়াস। মোহন-সমর্থকদের অনেক আশা এই খেলোয়াড়টিকে ঘিরে জমাট বেঁধেছে। যতটা বলা হয়েছিল ততটা আশা পায়াস কিন্তু জাগাতে পারেনি। তবে অসাধারণ ফুটবল সেন্স রয়েছে এই ছেলেটির মগজে। এখনও অবধি প্রতিটি ম্যাচেই দশ নম্বর জার্সি গায়ে পায়াস মাঠে নেমেছে এবং গোলও পাচ্ছে। তবে ওর মনে এমন একটা ভয় বাসা গেড়েছে যা ওকে আরও ভাল খেলা থেকে সরিয়ে রাখছে। এটা ঠিক পায়াসের হেডিং খুবই দুর্বল, ড্রিবলিংও খুব একটা উন্নত মানের নয়। তবে ট্র্যাপিং নিখুঁত এবং পাসিংয়ের জবাব নেই। শুধু একটু সাহস আনতে পারলেই পায়াসের পক্ষে দুর্দান্ত হয়ে উঠার কোনও অসুবিধে নেই।

ডান পায়ের প্রচণ্ড সট এবং উইথ দ্য বল স্পিড তপনের মূলধন। তপনের গোলের ভাগ্যও কদাচিৎ ওকে বিট্রে করে। কলকাতার মাঠ তপনের কাছে অপরিচিত নয়। মনে সাহসও আছে ওর। একটু নিশানা ঠিক করে এবং সামান্য বুদ্ধি খরচ করে পায়াসের নিখুঁত পাসগুলো তপন কাজে লাগাতে পারলে মোহনবাগান সমর্থকদের দুশ্চিন্তা নিঃসন্দেহে অনেক কমবে।

শ্যাম থাপা এমন একজন খেলোয়াড় যে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে। কেউ কেউ বলে শ্যাম হচ্ছে মোস্ট আনপ্রেডিকটেবল। কখন কি করবে বক্সের মধ্যে কাউকে তার হদিশ পেতে দেয় না। তবে শ্যাম এবার ফিফটি পারসেণ্ট নিষ্প্রভ। তার প্রধান কারণ প্র্যাকটিসের ঘাটতি। বয়সের বাধা কাটানোর মত মনের জোর শ্যামের আছে তবে প্র্যাকটিসের অভাবের ফলে ফিটনেসের ঘাটতিতে শ্যাম জানান দিচ্ছে

অবসরের সময় তার এসে গেছে। তবুও শ্যাম শ্যামই। এবং সেই কারণেই কেউই বলতে পারে না ৭ জুলাই হঠাৎই একটা অঘটন শ্যাম ঘটিয়ে দেবে কিনা।

এবছরও সবচেয়ে বেশী আশা ভরসা মাঝমাঠের গৌতম ও প্রসূনকে ঘিরে। গৌতম প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই এবছর ভাল খেলছে। অনেকে বলে গৌতম ভাল খেললেই ভাল খেলার এক্সট্রা ইনসপিরেশন প্রসূন পায়। প্রধানত ডিফেন্স করলেও গৌতম এবছর প্রতিটি খেলাতেই অনেকটা এগিয়ে আক্রমণে সাহায্য করছে। এবং গৌতম-প্রসূনকে এটা করতেই হবে। কারণ অ্যাটাকিং জোনে স্কিমারের অভাব পায়াস বা শ্যাম কেউই হানড্রেড পারসেন্ট পূরণ করতে পারছে না। দায়িত্ব তাই গৌতম-প্রসূনকেই পালন করতে হচ্ছে। ৭ জুলাই ম্যাচ জেতার দায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর করছে গৌতম-প্রসূন জুটির ওপর। কতটা ভাল ওরা খেলতে পারবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

মোহনবাগানের চার ব্যাককে নিয়ে কয়েকটা 'যদি' আছে। প্রথম ডিফেন্সের 'যদি' সবচেয়ে বেশী ভরসা যার ওপর সেই সুব্রতকে নিয়ে। নিঃসন্দেহে সুব্রত এখন ভারতের এক নম্বর স্টপার। ছ'ফুটি সুব্রতর হেডে যে পাওয়ার রয়েছে তা কারোরই নেই। স্টপার হিসেবে সুব্রতর স্কিলও রয়েছে যথেষ্ট। ওর পজিশন জ্ঞান এবং ট্যাকলিংও প্রমাণ করে ওর শ্রেষ্ঠত্ব। হয়ে যাওয়া বেশ কয়েকটি ম্যাচেই দেখা গেছে সুব্রতকে ডিঙিয়ে যাওয়া কতটা শক্ত।

অনেকবার বলা একটা কথা আরও একবার বলি। ঠাণ্ডা মাথায় খেললে সুব্রতকে পেরিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। ওর মধ্যে বিগ ম্যাচ টেম্পারামেণ্ট যতটা দেখেছি অনেকের মধ্যেই এ অভাব বড় প্রকট। অসম্ভব মনের জোর নিয়ে সুব্রত দুর্গ আগলায়। ও ঠিক থাকা মানে অনেকাংশে আশ্বস্ত হওয়া।

তবে সাধারণ খেলায় সুব্রত কয়েকটি চোখে পড়া গোছের ভুল করে ফেলে। ওভার কনফিডেণ্ট হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে বিপক্ষ আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের ডজ করে এগিয়ে যেতে চায়। স্টপার হয়েও যে ওর স্কিল কোন অংশে কোনও ভাল ফরোয়ার্ডদের চেয়ে কম নয়, এর প্রমাণ দিতে গিয়ে মনে হয় মাঝে মাঝেই সুব্রত খেই হারিয়ে ফেলে। এটা ঠিক বড় ম্যাচে এই সব জাহির করার ভেতর সুব্রত থাকে না। কিন্তু ওর মাথার ওই পোকাটা যদি কখনও কিলবিল করে ওঠে তাহলেই বিপদের আশংকা দেখা দেয়। ব্যক্তিগত-ভাবে ওকে এই কথাটা আমি বেশ কয়েকবার বলেছি প্রতিবারই ও লাজুক মুখে মিষ্টি হেসেছে।

সুব্রতর দোসর প্রদীপ চৌধুরী কিন্তু এবছর ওর ৭৬-এর ফর্মে নাইনটি পারসেণ্ট পৌঁছে গেছে। এর জন্যে ওর ইচ্ছেশক্তি এবং কোচ পি কে-র অক্লান্ত পরিশ্রম ক্রেডিট নিতে পারে। শ্যাম, উলাগা, সুধীর ও প্রদীপের জন্য পি কে এবার সকাল-বিকেল প্র্যাকটিস সিডিউল তৈরি করেছিলেন। শ্যাম, উলাগা কলকাতায় এসেছে প্র্যাকটিস শুরুর দীর্ঘদিন পর, সুধীর মাঝে মাঝেই প্র্যাকটিস থেকে ছুটি নিয়েছে। শুধু পি কে-র ভাষায়, প্রদীপ অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওর ঘাটতি পুষিয়ে দিয়েছে। প্রদীপ জানে ওর স্কিল কম,তাই কখনও স্কিলের বড়াই করতে ও যায় না। সারাক্ষণই স্ত্রেফ খেলে যায়। বড় টিমে এবং বড় ম্যাচে এই খেলারও একটা দাম আছে। ৭৬-এর লিগে ইডেনের থকথকে কাদাতে প্রদীপ যে খেলা খেলেছিল ৭ জুলাই সেটুকু উপহার দিতে পারলেই মোহনবাগান নিশ্চিত।

শ্যামলের খেলায় কিছুটা জড়তা রয়েছে। মাঝে মাঝেই ঠিক উপযুক্ত সময়ে ট্যাকলিং করতে ও ভুলে যায়। এবারের ডুরাণ্ডে বহুবার এই ভুলের খেসারত ওকে দিতে হয়েছে। প্রথম দিককার নার্ভাসনেসটা কাটিয়ে উঠতে পারলেই শ্যামল অনেকটা নিশ্চিত।


শ্যামলের গতিবেগ এবং ট্যাকলিং মোহনবাগানকে প্রেরণা দেবে।

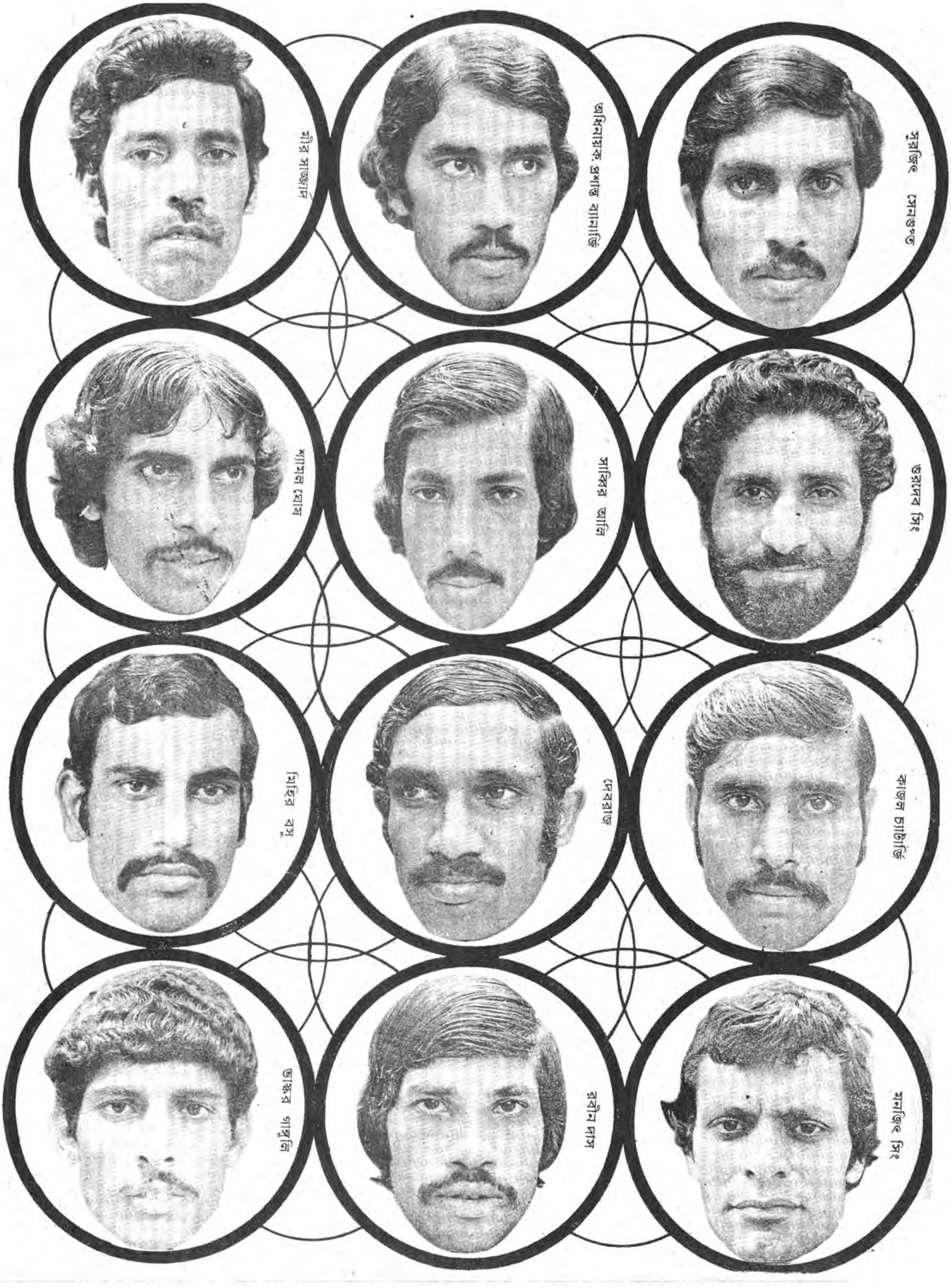
দিলীপ এবার অধিনায়ক। সেই সুবাদেই ওর নিজের স্বাভাবিক খেলা কি ও খেলতে পারছে না? একটা স্বীকৃত সত্য লিখি। মোহনবাগানের লেফট ব্যাকে দিলীপের মুখোমুখি সুরজিত কখনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেনি। দিলীপ সম্পর্কে সুরজিতের কিছুটা অ্যালার্জি আছে? জানি না। তবে সত্যিই যদি থাকে তো সে সুযোগটা দিলীপের পুরোপুরি গ্রহণ করা উচিত। দিলীপের কড়া ট্যাকলিংগুলি ওর মূলধন। অনেক বছর ও মোহনবাগানে খেলছে। এবার অধিনায়ক। এতদিন অনেক কিছুই ও দিয়েছে। ক্লাব যদি ওর অধিনায়কত্বে এবছর ওর কাছ থেকে একটু বেশী আশা করে তাহলে নিশ্চয় সেটা দোষের কিছু নয়। ডুরাণ্ড ও রোভার্সে হোঁচট খাওয়ার কলঙ্ক দূর করে দিলীপকে প্রমাণ করতে হবে তার অধিনায়কত্বে দলকে সেও কিছু দিতে পারে।

শেষ প্রহরী প্রতাপ ঘোষ। বলা হয় আধুনিক ফুটবলে গোলকিপারের কাছ থেকেই শুরু হয় আক্রমণ; রক্ষণভাগের শেষ দুর্গও গোলরক্ষক। কোচ পি কে এবং অরুণ ঘোষের মতে কয়েকটি ব্যাপারে প্রতাপ ভাস্করের চেয়েও দুর্দান্ত। যেমন ঠিক সময়ে গোল ছেড়ে বেরিয়ে আসা। ওয়ান টু ওয়ান প্রতাপ প্রায় দুর্ভেদ্য। অসম্ভব সাহস আছে ছেলেটির। আর প্লাস পয়েণ্ট হিসেবে আছে লম্বা সট এবং শারীরিক উচ্চতা যা সব সময়েই বিপদের কারণ। তবে বড় ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা প্রতাপের কম। সামান্য ভুলেই ওই খেলায় সব উল্টে যেতে পারে। অনেক কিছু নির্ভর করছে প্রতাপের ওপর। এবছরের লিগে বার কয়েক ও নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। তবে কলকাতার ফুটবল তো? সবকিছুরই মাপকাঠি একটি ম্যাচ এবং সেটিই আসল।

যে ম্যাচটিকে ঘিরে এত কিছুর প্রস্তুতি, ৭ জুলাই সন্ধ্যাতেই তার ফয়সালা হবে। মোহনবাগান না ইস্টবেঙ্গল, সবুজ-মেরুন না লাল-হলুদ কে বড় তার ফয়সালা প্রতিবছরই এভাবে দু'একবার হয়ে থাকে। এবারও হবে তবে উপরি হিসেবে এবার প্রমাণিত হবে আরও একটি সত্য। কারা শ্রেষ্ঠ—বাংলায় প্রতিষ্ঠিত বাংলার ফুটবলার না সর্বভারতীয় তকমা আঁটা ভিনরাজ্যের স্টারেরা। কোন দলের জয় কোন প্রমাণ বহন করবে সেটুকু না লিখলেও পাঠক কি বুঝে নেবেন না জিতটা আসলে কাদের হল?



সত্যজিৎ মিত্র
কোচ অরুণ ঘোষ
হরজিন্দার
তরুণ বসু
EAST BENGAL CLUB CALCUTTA
ইস্টবেঙ্গল
১৯৭৯
ডেভিড উইলিয়ামস
সুভাষ ভৌমিক
ম্যাথুজ
অমিত গুহ
চিন্ময় চ্যাটার্জি
অশোক চন্দ
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য


মীর সাজ্জাদ
অধিনায়ক প্রশান্ত ব্যানার্জি
সুরজিৎ সেনগুপ্ত
শ্যামল ঘোষ
সাব্বির আলি
গুরদেব সিং
মিহির বসু
দেবরাজ
কাজল চ্যাটার্জি
ভাস্কর গাঙ্গুলি
রবীন দাস
মনজিৎ সিং

গত এক বছরে ইস্টবেঙ্গল

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ গতবার ইস্টবেঙ্গল লিগ পায়নি, শিল্ডও না। জয় করেছে বরদলুই ট্রফি ও ডুরাণ্ড কাপ এবং রোভার্সে টিম যায়নি। এই হল এক নজরে গত বছরের ইস্টবেঙ্গল। একটা কথা কেউই অস্বীকার করবেন না, লিগ এবং শিল্ড, বিশেষ করে লিগ জয়ে সদস্য সমর্থকদের অন্তর যেরকম উল্লাস ও আনন্দে মাতোয়ারা হয়, অন্য কোন ট্রফি লাভ তাদের সেভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারে না। ৭৭-এ লিগ হারালেও মোহনবাগান ঘরে এনেছিল ত্রিমুকুট বিজয়ের সম্মান। কিন্তু লিগে পরাজয়ের পর সমর্থকদের সেই ক্ষোভের কথা অবশ্যই সকলের মনে আছে। থাকারই কথা। ক্লাব কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড়দের সেদিন ফেস করতে হয়েছিল সাপোর্টার্স-মেম্বারদের তীব্র ক্ষোভ। আবার ৭৭-এ ইস্টবেঙ্গল লিগ এবং তার আগে ফেডারেশন ছাড়া আর কিছুই পায়নি। এতে ক্লাব সমর্থকরা দুঃখিত ও বিমর্ষ বোধ করেছেন, কিন্তু বিক্ষোভে উত্তাল হননি, আসলে প্রধানত লিগ এবং অবশ্যই কিছু পরিমাণে শিল্ডের আবেদন এখানকার ফুটবল পিপাসু সমর্থকের মনে এতটা বাসা বেধেছে যে, অন্য প্রতিযোগিতায় ক্লাবের জয়ে বা হারে তারা সুখ কিংবা বেদনা অনুভব করেন ঠিকই, তবে সেই অনুভবের প্রকাশ তেমনভাবে কখনোই ফেটে পড়ে না। আমার ধারণায় সার্বিকভাবে গতবারের ইস্টবেঙ্গলের ভূমিকা মোটামুটি ভালোই ছিল।

৭৭-এর লিগ চ্যাম্পিয়ন ৭৮ মরশুমের প্রথম ট্রফিটি বাঁটোয়ারা করে নেয় তার চির প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান দু'দলই যুগ্মভাবে ফেডারেশন কাপের দখল নিয়ে নিজেদেরকে ভারতের সেরা ফুটবল দল হিসাবে প্রতিপন্ন করে। তার কিছুদিন পরেই শুরু হয় কলকাতার পাগল করা ফুটবল-লিগ। পুলিশকে সাত গোল দিয়ে ইস্টবেঙ্গল লিগ শুরু করে। নিঃসন্দেহে শুভ-সূচনা। গ্যালারিতে আনন্দের ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে। ঝপ করে সেটা থেমে যায় দ্বিতীয় ম্যাচেই ইস্টবেঙ্গল মাত্র ২—১ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারায়। কিন্তু তারপরের শূন্যতার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। তৃতীয় খেলায় উয়াড়ির কাছে ০—১-এ হেরে গেল ইস্টবেঙ্গল। অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় চমকে উঠলেন সবাই। সাম্প্রতিককালে কোন ছোট টিম এমনভাবে লিগে বড় দলকে ধাক্কা দিতে পারেনি। উয়াড়ি দিল। দিল লিগের চাকা ঘুরিয়ে। জনতা বিক্ষুব্ধ হলেন।



মিহির পুলিশের বিপক্ষে নেমে মরশুমের (৭৮) প্রথম গোল করলে [illegible] কিছু জাতি উৎসাহী দর্শক জড়িয়ে ধরে ওকে।

অতঃপর চতুর্থ ম্যাচে পোর্ট ট্রাস্টের সঙ্গে ১—১ ড্র। এবং ইস্টবেঙ্গলের লিগ পাবার আশা কার্যত এখানেই শেষ হয়ে গেল। তারপরেও টিমটা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। এবং পরের সব কয়টি ম্যাচ জিতে মুখোমুখি হলো মোহনবাগানের। ইস্ট-সমর্থকেরা বদ্ধপরিকর মন নিয়ে মাঠে এল—লিগ না পাই, বিপক্ষকে আজ হারাতে হবে। কিন্তু হেরে গেল ইস্টবেঙ্গলই, শ্যামের দেওয়া গোলে। ইস্টবেঙ্গল-জনতা সুরজিতের নিন্দায় মুখর হল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সুরজিত গোল করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি। অধিনায়ক সুরজিত লিগে মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠা ছাড়া সুবিধা করতে পারে নি ঠিকই। আবার এই সুরজিতই বরদলুই, শিল্ড এবং ডুরাণ্ডে আক্ষরিক অর্থেই রাজার মত মাঠে বিচরণ করেছে। আসলে, একজন ফুটবলার সবসময় ভালো খেলতে পারে না। তার চেয়েও বড় কথা, কোন খেলোয়াড় কখনই ইচ্ছা করে বাজে খেলে না, খেলতে পারে না। মোহনবাগান লিগ চ্যাম্পিয়ন হল, ৪ পয়েন্ট পিছনে থেকে রানার্স হল ইস্টবেঙ্গল।

লিগ এবং শিল্ডের মাঝে ইস্টবেঙ্গল বরদলুই ট্রফি খেলতে গৌহাটি যায়। লিগের ফল অবশ্যই ক্লাবের মাথা কিছুটা নুইয়ে দিয়েছে, বিমর্ষ করেছে সমর্থকদের। তাই, হারিয়ে যাওয়া মনোবল চাঙ্গা করতে ও শিথিল অনুভূতিতে প্রাণ সঞ্চার করতে বরদলুই পাওয়াটা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে একান্ত জরুরী ছিল। এবং ইস্টবেঙ্গল সেটা সাধন করেছে। ফাইনালে থাইল্যাণ্ডের বেশ কয়েকজন জাতীয় খেলোয়াড় পুষ্ট শক্তিধর পোর্ট অথরিটি দলকে হারিয়েছে মনোরঞ্জন ও সত্যজিৎ ছাড়াই। আসাম পুলিশের সঙ্গে দ্বিতীয় লিগ সেমিফাইনাল খেলায় মনোরঞ্জন আহত হয়, অসুস্থ ছিল সত্যজিৎও। তবু, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও বদ্ধপরিকর মন নিয়ে লড়ে আগাগোড়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঠাসা ফাইনালে পোর্ট অথরিটিকে ৪—২ গোলে হারায় ইস্টবেঙ্গল। চারটির দুটি গোল সুরজিতের, বাকি দুটি মিহিরের। ব্যাঙ্ককের দলটির বিরুদ্ধে সুরজিতের খেলা অনবদ্য স্তরে পৌঁছেছে। চ্যাম্পিয়ন হলেও বরদলুই ট্রফি ইস্টবেঙ্গলের ঘরে আসেনি। কেন আসেনি সে কাহিনী সকলের মুখস্থ।

বরদলুই জয় টিমটাকে অবশ্যই চাঙ্গা করে। অতঃপর শিল্ড। শিল্ডে একমাত্র অংশগ্রহণকারী বিদেশী দল সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপার লিগ টিম আরারাত সেমিফাইনালে (অবশ্যই যদি ওঠে একথাটা বলা ছিল) দু'প্রধানের কার সঙ্গে খেলবে, সেটা নির্ধারণের জন্য লটারি করা হয়। লটারির ফলে আরারাত ইস্টবেঙ্গলের দিকেই থাকে।

সেমিফাইনালে দু'দল মুখোমুখি হয়। এবং ইস্টবেঙ্গল বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষে ভালো খেলার সুনাম বজায় রেখে, প্রায় শেষ পর্যন্ত বুক চিতিয়ে ওদের আটকে দিয়ে খেলা ভাঙার মিনিট চারেক আগে আনদ্রানিক খাচাত্রিয়ানের দেওয়া একমাত্র গোলে হেরে যায়। এদিন ইস্টবেঙ্গলের যা কিছু আক্রমণ, প্রধানত সুরজিতকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের পরাজয় মোটেই অগৌরবের নয়। আরারাতের মত টিমের কাছে হেরে যাওয়ায় লজ্জা নেই। তাই বলে 'জেতা যায় না' বলেও কোন কথা থাকতে পারে না। ইস্টবেঙ্গল ভিন্ দেশী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এখানে জিতেছেও। তাই একটা কথা থেকেই যায়, প্রথম ৪৫ মিনিট আরারাতকে রুখে দেওয়ার পর সেকেণ্ড হাফে আক্রমণের ফলাটা ইস্টবেঙ্গলের বাড়ানো উচিত ছিল। প্রয়োজন ছিল আরও বেশী মাত্রায় বিপক্ষ ডিফেন্সকে ব্যস্ত ও বিব্রত রাখা।

শিল্ডের পর বেশ কিছুদিন মৌন। এরমধ্যে পালা চুকলো এশিয়ান গেমসের। এবং তারপরই ডুরাণ্ডের আসর দিল্লিতে। আর এই ডুরাণ্ড জয়ই '৭৮ মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড়





গতবার (৭৮) লিগে দুই মহারথীর খেলায় ইস্টবেঙ্গল গোলমুখে হেড নিচ্ছে মোহনবাগানের আকবর

সাফল্য। ডুরাণ্ডের প্রথম ম্যাচ থেকেই ইস্টবেঙ্গল আত্মবিশ্বাসের জমির উপর দাঁড়িয়ে খেলেছে। এবং সেইমত দৃঢ়ভাবে পা ফেলে চলে এসেছে ফাইনালের কোঠায়। অন্য দিক থেকে ফাইনালে উঠে আসে মোহনবাগান। অর্থাৎ দু'প্রধান আবার মুখোমুখি। ইস্টবেঙ্গলের সামনে সুযোগ এল লিগের পরাজয়ের জবাব দেওয়ার। এবং তারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। তিন গোলে হারাল চিরন্তন প্রতি-পক্ষকে। তিন গোল? হ্যাঁ, ৭৫-এর পর দু'প্রধানের পারস্পরিক লড়াইয়ে কোন পক্ষই তিন গোলের ব্যবধানে জয় পায়নি। ফাইনালে মোহনবাগান ডিফেন্স সুব্রতহীন ছিল। তবে, প্রত্যক্ষদর্শীর মতে সুব্রত থাকলেও সেদিন ইস্টবেঙ্গলের জয় আটকাত না। আর সুব্রতর বদলে সেদিন যে জার্সি পরেছিল, সেই সুধীর কর্মকার, এক কথায়, অনবদ্য খেলেছে। প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে ছিল দু'গোলে। সেকেণ্ড হাফে অবশ্য মোহনবাগান সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লাল-হলুদের রক্ষণে। কিন্তু গোল পায়নি। এই অবস্থায়, খেলা ভাঙার কিছু আগে অনেকটা গতির বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল তৃতীয় গোল পায়। গোল তিনটি ভাগ করে নেয় সুরজিত, মিহির ও তপন দাস। রোভার্সে টিম যায়নি। অতএব, ডুরাণ্ড বিজয় দিয়েই ইস্টবেঙ্গল ৭৮-এর ফুটবল মরশুম শেষ করে।

গত বছর যারা ইস্টবেঙ্গলকে টেনে নিয়ে গেছে, এবার তাদের কথায় আসা যেতে পারে। গোলকিপার দিয়েই শুরু করা যাক। লিগের প্রথমদিকে ভাস্করকে বিচলিত ও নার্ভাস দেখেছি। কিন্তু তারপর যথারীতি সে তার স্বকীয় দক্ষতায় গোলরক্ষা করে গেছে। লিগে মোহনবাগান ও আরারাত ম্যাচ বরদলুই বা ডুরাণ্ড যেদিকেই তাকানো যাক, দেখা যাবে এক সাহসী, অনমনীয় ও দুর্দান্ত ভাস্করকে। ডিফেন্সে অন্যান্যদের দক্ষতার কথা মনে রেখেও আমি তুলে নিয়ে আসব মনোরঞ্জনকে। এবং এব্যাপারে আমার সঙ্গে সকলেই নিশ্চয়ই চোখ বুজে একমত হবেন। লিগ শুরুর আগে দলে যার স্থান পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল, সেই মনোরঞ্জন এমন দুর্দান্তভাবে যে মাত্র এক বছরের মধ্যে উঠে আসবে, সেটা ভাবা যায়নি। বরদলুই সেমি-ফাইনালে ঝুঁকি নিয়ে মরিয়া প্রচেষ্টায় গোল করতে এগিয়ে যাবার জন্যেই ওর হাত ভাঙে। এই দুর্ভাগ্যের জন্য বেশ কিছুদিন মাঠ থেকে দূরে থাকার পর ডুরাণ্ডে আবার মাঠে নেমেই সে যে খেলা খেলেছে, তা বুঝি ওর পক্ষেই সম্ভব। মনোরঞ্জন ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের টাওয়ার।

হাফে প্রশান্ত ব্যানার্জি লিগের শেষদিক থেকে অসম্ভব ভালো খেলেছে। এবং তার পাশেই রয়েছে সমরেশের অভিজ্ঞতা। লিগের প্রথমদিকে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ে টিমটার যখন আগোছাল অবস্থা, তখন সমরেশ, সুরজিতদের মত সিনিয়র প্লেয়ারদের যে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত ছিল ওরা তা এসেছে। ডুরাণ্ড জয়ের পিছনে সমরেশের বড় ভূমিকা ছিল। এবং সারা মরশুমে কিছু ম্যাচে ওর বুদ্ধি ক্ষিন এবং অভিজ্ঞতা দলের গোলের পথ খুলে দিয়েছে।

ফরোয়ার্ড লাইনে অবশ্যই প্রথমে আসবে সুরজিত। লিগের বিভ্রান্তিকর মুহূর্তগুলো বরদলুই ও ডুরাণ্ডে সে ধুয়ে-মুছে দিয়েছে। আক্রমণ চালিত হয়েছে তার নেতৃত্বেই। মরশুমের শুরুটা মন্দ হলেও সুখকর সমাপ্তি ক্যাপ্টেনকে আনন্দ দিয়েছে। সে বলেওছে, সব ভালো যার শেষ ভালো। আর একটা কথা লিগে স্বাভাবিক দক্ষতার পূর্ণ প্রকাশ না ঘটাতে পারলেও সুরজিতের এমন কয়েকটা গোল দেখেছি, যা শিল্পীসত্ত্বা ও সৌন্দর্যবোধকে জাগিয়ে তোলে। একটা ক্ল্যাসিকাল ছবির মত পুরো ব্যাপারটা সম্পন্ন হয়।

সুরজিতের পাশে সহায়তার সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়েছে মিহির বসু। মিহির খাটতে পারে এবং ওর মত পরিশ্রমী অফেণ্ডার বর্তমান ভারতীয় ফুটবলে খুব কমই আছে। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মিহির মাঠে দক্ষতা ছড়িয়েছে, বিপক্ষের জালে বল পাঠিয়েছে এবং যথাসাধ্য সাহায্য দিয়েছে দলকে জয় পেতে। বরদলুই বা ডুরাণ্ডের মত গুরুত্বপূর্ণ আসরেও তার নামের পাশে গোল লেখা রয়েছে।

তপন দাস গতবারই প্রথম বড় দলের জামা পরেছে। এবং সেটা মানিয়েও নিয়েছে। সাবির আলি মাঠে নামার পর অবশ্যই তার সুযোগ সংকুচিত হয়েছে। তবু গতবারের লিগে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে সর্বোচ্চ গোলদাতার শিরোপাটি অধিকারে রেখেছে তপনই, তার সংগ্রহ ১৬টি গোল। উলাগা অধিকাংশ ম্যাচেই গতবার তার নামের প্রতি সুবিচার করেনি।

পর পর দুবার সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার সফল কোচ অরুণ ঘোষ ক্লাব কোচ হিসাবে কিন্তু শুরুতেই ব্যর্থতার ধাক্কা খেয়েছেন। ৭৫-এ মোহনবাগানের কোচ থাকাকালীনই সেটা প্রমাণিত। ৭৮-এ ইস্ট-বেঙ্গলের কোচ হয়েও প্রথমটা তার শুভ যায়নি। টিম লিগ হারিয়েছে, শিল্ডও। তবে শিল্ডে হারাটা, আবার বলছি, মোটেই মর্যাদাহানিকর ব্যাপার নয়। অতঃপর অরুণ ঘোষ প্রথম সাফল্যের মুখ দেখলেন ইস্টবেঙ্গলের বরদলুই জয়ের মধ্য দিয়ে। এরপর তার টিম পেল ডুরাণ্ড কাপও। এবং এই পাওয়া ক্লাব কোচ হিসাবে অরুণ ঘোষকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করিয়েছে।

৭৯ অর্থাৎ এবারের মরশুমের জন্য ইস্টবেঙ্গল বেশ কিছু সংখ্যক বাইরের খেলোয়াড় সংগ্রহ করেছে। এবং সংগ্রহের লিস্টে কে কে আছে, তা সকলেরই জানা। লিগের ব্যর্থতাতেই ক্লাব কর্মকর্তারা এই কাজে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। তবে আমার ধারণা, বাইরের খেলোয়াড় আনার ব্যাপারে সময়ের ক্ষেত্রে যদি কোন বাধ্য বাধকতা না থাকত, অর্থাৎ যে কোন সময়ে (এক্ষেত্রে আমি প্রতি বছরের মরশুম শুরু হওয়ার আগের যে সময়টা, তার কথাই বলছি) এটা করা যেত। তাহলে, ইস্টবেঙ্গলের ডুরাণ্ড সাফল্যের পর ক্লাব কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই এতজন বাইরের ফুটবলার জোগাড়ের দিকে ঝুঁকতেন না। ডুরাণ্ডে ইস্টবেঙ্গলের ভূমিকা তাই-ই বলে।

মন্ত্রীরাও খেলার মাঠে, কিসের টানে

বিশ্বজিৎ সিংহ

যতীন চক্রবর্তী :

বয়সটা আর খেয়াল থাকে না

মাঠে গেলেই চোখে পড়ে ছোটোখাটো চেহারার এক নাদুসনুদুস মানুষ লাইনের ধারে রিজার্ভ প্লেয়ারদের পাশে বসে। খেলার উত্তেজনার মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকারও করছেন। হাতে ধরা ইয়া লম্বা চুরুট নিভে গেলেও খেয়াল নেই।

ওই মানুষটিই কখনো আবার কর্মকর্তাদের ডেকে ধমক দেন। কোন দল আগে মাঠে নামবে এ নিয়ে সালিশের ভূমিকা নেন। দর্শকরাও দাবি মেটাতে ঘিরে ধরেন একেই।

ইনি যতীন চক্রবর্তী। বর্তমানে রাজ্যের এক জবরদস্ত মন্ত্রী। পূর্ত ও আবাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। তবে মাঠের মানুষের কাছে তিনি 'জ্যাকিদা'।

যতীনবাবু মাঠে আসছেন সেই পঞ্চাশ বছর আগে থেকে। একটানা। তখন মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের এক মাঠ ছিল। টেণ্টও নাকি এক।

ক্লাস এইটের ছাত্র শ্রীচক্রবর্তী লুকিয়ে চুরিয়ে মাঠে আসতেন। সে আমলেও দারুণ ভিড়। লাইনে দাঁড়াতেন কয়েক ঘণ্টা আগেই। ঠেলাঠেলিও হতো। চাপে কখনো সখনো ছিটকেও পড়তেন। ছোট্ট ছেলেটিকে পুলিস আর অন্য দর্শকরা টপকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিতেন।

যতীনবাবু মোহনবাগানের ভক্ত। এখনও। স্কুলে পড়ার সময় রাজনীতি করতেন। খেলার ক্লাব মোহনবাগান তার কাছে ছিল জাতীয়তার প্রতীক। নিজে বক্সিং শিখতেন, দৌড়ে ছিলেন



যতীন চক্রবর্তী

ওস্তাদ। বলাই চ্যাটার্জি গুরু। তিনি আবার সব সময় মোহনবাগানে খেলতেন।

আগের আমলে শ্রীচক্রবর্তীর খেলা ভালো লাগতো কুমারবাবু, সূর্য চক্রবর্তী, মোনা দত্ত, রবি গাঙ্গুলি, গোঁসাই-এর। পরে

> সব আমলেই খেলা পাগল কয়েকজন মন্ত্রী থাকেন যারা দুপুর গড়ালেই মহাকরণে এয়ার-কণ্ডিসণ্ড ঘর ছেড়ে রোদ্দুরে পোড়া বা জলে ভেজা মাঠে হাজির। নিজের প্রিয় দলের খেলা থাকলে তো কথাই নেই। কেউ কেউ ঠিক সময়ে মাঠে যাবার জন্য সকাল সকাল ফাইলপত্র সেরে রাখেন। ফিক্সচার দেখে ট্যুর প্রোগ্রাম তৈরি করেন। জরুরী মিটিং-এর দরুণ মাঠে যেতে না পারলে অনেকের আবার হাসিমুখ গোমড়া হয়ে যায়। এতো রাজনৈতিক জনসভা নয়, তবু কিসের টানে তারাও মাঠে যান? তিন বর্তমান আর দুই প্রাক্তন মন্ত্রীকে নিয়ে সেই প্রশ্নেরই জবাব।

শৈলেন মান্না, চুনী গোস্বামীর খেলা। এখন সুব্রত, প্রসূন, গৌতম তার কাছে সেরা।

রাজনীতিতে কখনো দল বদল করেননি যতীনবাবু। মাঠেও না। তবে মোহনবাগানের গোঁড়া সমর্থক হলেও খেলার জগতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অবদান তিনি নিজেই বারবার উল্লেখ করেন।

আগে প্রিয় দল জিতলে তিনি খুব হৈ চৈ করতেন। বলাইদা বেঁচে থাকা পর্যন্ত জোর খাওয়া দাওয়া হতো। এখন হুল্লোড় করেন না। তবে হারানো দিনের আনন্দ এখনও অনুভব করেন। মোহনবাগান হেরে গেলে মন ভারী খারাপ হয়। কয়েক ঘণ্টার জন্য অন্য মানুষ হয়ে পড়েন।

খেলার মাঠে যাবার মতো যতীনবাবু জেলেও নিয়মিত ঢুকেছেন। আবার শুধু খেলা দেখার জন্য গ্রেফতারি এড়াতে গা ঢাকাও দিয়েছেন। ষাটের দশকের ঘটনা। মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গলের কুসিয়াল ম্যাচ। আগের দিন রাতে শ্রীচক্রবর্তী খবর পেলেন, রাজনৈতিক কারণে পুলিশ তাকে ধরবে তাহলে তার আর খেলা দেখা হয় না। তিনি পালালেন। বিধানসভা ভবনে রাত কাটিয়ে বিকালে রুমালে মুখ ঢেকে গেলেন খেলার মাঠে। প্রেসবক্সের পিছনের সারিতে। তখনকার মন্ত্রী জগন্নাথ কোলে আর রবীন্দ্রলাল সিংহ তাকে দেখে অবাক। মাঠ থেকে বেরিয়ে যতীনবাবু ধরা দিলেন পুলিসকে।

আর একটি ঘটনা। সেই মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল লড়াই। সেদিন আবার বামপন্থী দলগুলিও মিছিল বের করেছেন। মনুমেণ্ট থেকে যাবেন হেদুয়া সামনের সারিতে জ্যোতি বসুর পাশেই যতীন চক্রবর্তী।

চৌরঙ্গীর মোড়ে পা দিতেই হঠাৎ চিৎকার। এক কোণে রেডিও হাতে জটলা। ইস্টবেঙ্গল গোল দিয়েছে। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত হাসিমুখে খবর দিতেই বিষাদগ্রস্ত যতীনবাবু পিছনে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর মিছিল তখন ধর্মতলা পেরিয়ে কমলালয় স্টোর্সের সামনে। আবার নিনাদ। শ্রীচক্রবর্তী শুনলেন, মোহনবাগান গোল দিয়েছে। সামনে তক্ষুণি ছুটে এসে খবরটা জোরে জোরে শুনিয়ে দিলেন। নিরঞ্জনবাবু পিছনে চলে গেলেন।

বর্তমান বামফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাতে এসেও শ্রীচক্রবর্তী পায়াস আর ডেভিড উইলিয়ামসের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু বিরোধ হয় না। কেন উনি বললেন, মাঠে নিয়মিত যান কমল গুহ, কানাই ভট্টাচার্য আর সুধীন কুমার। সবাই এক ক্লাবের সমর্থক। তার বাড়ির সকলেও মোহনবাগানের ভক্ত।

মন্ত্রী হয়েছেন বলে যতীনবাবুকে মাঠে যাবার সময় করে নিতে হয়। এখন সব খেলা দেখতেও পারেন না। ডায়েরীর মধ্যে ফিক্সচার লুকিয়ে রেখেছেন। চুপিচুপি নিজে দেখে মিটিং আর ট্যুর প্রোগ্রাম ঠিক করেন।

যতীনবাবুর মতে, বর্তমানে খেলার মান নেমে গিয়েছে। দল বদল যেন পেশা। আগে এরকম ছিল না। সমর্থকদের মধ্যেও এখন বড় বেশী উগ্রতা। সবাই চায়, তার দলকে জিততেই হবে। অথচ সব প্লেয়ারের ফর্ম সর্বদিন সমান থাকার কথা নয়। এটা বোঝা দরকার।

সাতষট্টি বছরের 'জ্যাকিদা'র খেলার প্রীতি টান কমেনি। কিসের জন্য? যাকে প্রশ্ন, তিনি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন : চুপিচুপি বলি 'মাঠ আমাকে টানে। বয়সটা আর খেয়াল থাকে না।'

ডঃ কানাই ভট্টাচার্য :

খেলা ভালবাসি, তাই

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। নৌকা কিংবা স্টিমারে নদী পেরিয়ে এক কিশোর হাওড়া থেকে কলকাতার মাঠে খেলা দেখতে


ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য

আসতো। লাইনে দাঁড়িয়ে চার আনা দামের একটি টিকিট যোগাড় করতেই হিমসিম। পুলিশী-ঘোড়ার চাঁটও খেয়েছে।

সেই কিশোর এখন গাড়িতে মাঠে আসেন। ভি আই পি কার্ড হাতে। পুলিশ স্যালুট করে।

মাঠে ঢোকার পর্ব বদল হলেও রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য দল বদল করেননি। ছেলেবেলায় মোহন-বাগানের সমর্থক ছিলেন। আজও তাই। বাড়িতেও সব মোহনবাগান।

কানাইবাবু প্রথম খেলা দেখেন স্কুল পালিয়ে। ১৯৩২—৩৩ সালে। মোহন-বাগানের সঙ্গে কে আর আর দলের খেলা। যদ্দূর মনে পড়ে, হামিদও খেলেছিলেন।

সে আমলে তার প্রিয় খেলোয়াড় ছিলেন বিমল চ্যাটার্জি। ইনসাইড। কেরানী ছিলেন। বিড়ি মুখে যেতেন। নিরীহ চেহারা। মাঠে কিন্তু বাঘ। গোষ্ঠ পালকেও শ্রীভট্টাচার্যের পাহাড় মনে হত। তবু তার দল গোরাদের কাছেই প্রায় পরাজিত হত।

আর হারলেই কানাইবাবুর বুকে ব্যথা লাগে। এখনও হয়। ফাইলপত্রে মন বসে না। তবে জিতলে? মুড হয়ে ওঠে জয়ফুল।

এ মরশুমে প্রতিদিন মাঠে যেতে পারেননি। কোনো খেলাই তার মনে দাগ কাটেনি। সেক্রেটারিদের বলে রেখেছেন, মোহনবাগানের খেলা থাকলে সকালেই ফাইল-টাইল টেবিলে দিতে। মাঝে একদিন হঠাৎ মিটিং-এর জন্য যেতে পারেননি। মুড অফ। রিসিভার তুলে বারবার জিজ্ঞেস করেছেন ঃ এখন রেজাল্ট?

কোন দল সেরা এ নিয়ে অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে কানাইবাবুর মতান্তর হয় না। তবে পার্টি অফিসে ঝগড়া বেঁধে যায়।

সরকারী ছাপাখানার ফুটবল দল অফিস লিগে খেলে। ক্যাবিনেটে স্পেশাল পার্মিশন করিয়ে তিনি ছ'জন খেলোয়াড়কে চাকরি দিয়েছেন। আইনকানুন বড় বাধা। না হলে আরো খেলোয়াড়ের চাকরির ব্যবস্থা করতে পারলে খুশী হতেন।

কানাইবাবুও প্রবীণ। মাঠে যাবার ব্যাপারে তিনি কিন্তু সেই ছেলেবেলার মত। কেন যাই? উনি বললেন ঃ খেলা ভালবাসি, তাই।

কমল গুহ ঃ
আমিও যেন ওই বাইশের এক

তেরো বছর আগেও কমল গুহ নিজে ফুটবল খেলতেন। পজিসন ছিল হাফ ব্যাক। স্কুল, কলেজ টিমেও চান্স পেয়েছেন। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীর বয়স এখন পঞ্চাশ।

খেলা পাগল বুঝলে, শ্রীগুহ এখন অনেককেই টিকিট দেন। কিন্তু কিশোর বয়সে তাকে একটি টিকিটও জোগাড় করতে হয়েছে লাইন দিয়ে।

মন্ত্রী মশাইয়ের প্রিয় দল মোহনবাগান। মাঝে ইস্টার্ন রেলওয়ের খেলাও দারুণ ভাল লাগত। প্রিয় খেলোয়াড় ছিলেন শৈলেন মান্না, আমেদ। এখন সুরজিৎ, মানস, গৌতম, প্রসূন, মনোরঞ্জন।

নিজের দল জিতলে কমলবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন। বাইরের কেউ জানেনা, এদিন তিনি রাজভবন মন্ত্রী নিবাসে ফিরে বলেন, স্পেশাল মেনু বানাও। আর হারলে এ দুঃখী প্রশ্নের উত্তর উনি মনেও আনতে চান না।

বড় ক্লাবের সমর্থক হলেও শ্রীগুহ ছোটো টিমের খেলা দেখতে যান। এবার টালিগঞ্জ অগ্রগামীর খেলা ভাল লেগেছে। তবে রাইটার্সে এসে মাঠে যাবার সময় করে নিতে অসুবিধা হচ্ছে।

ঠিক সময়ে হাজির হবার জন্য ডায়েরিতে


কমল গুহ

ফিকশ্চার নোট করে রেখেছেন। খেলার দিন তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সারেন। ক্যাবিনেট সাব-কমিটির মিটিং থেকে ছুটি নিয়ে খেলার মাঠেও গিয়েছেন। যেতে না পারলে মন যে বড় ছটফট করে।

মাঠে পাশে পান পূর্তমন্ত্রী যতীনবাবুকে। কখনো পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবু ব্যানার্জি, শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারিও থাকেন। ফুটবল ছাড়া ভালবাসেন ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেনিস।

কমলবাবুর মতে, এ মরশুমে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত খেলা তেমন জমে ওঠেনি। তবে চারটে টিম ওঠানামার যে নিয়ম আই এফ এ করেছে তাতে ভাল ফল হয়েছে। ছোটো দলগুলি টি'কে থাকার জন্য সংগ্রামমুখী। বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলছে।

সরকারী তরফে শ্রীগুহ ছোটো দলগুলিকেই মদত দেবার পক্ষে। তার দফতরকে নির্দেশও দিয়েছেন, আইনে বাধা না হলে এসব খেলো-য়াড়দের যেন চাকরিতে সুযোগ দেওয়া হয়।

খেলার মাঠে লাইনের ধারে বসে খেলা দেখতে দেখতে কমলবাবু ছেলেবেলায় ফিরে যান। মনে হয়, তিনিও যেন ওই বাইশ জনের একজন। মন্ত্রীত্ব, পুলিসের স্যালুট, ফ্ল্যাগ আঁটা গাড়ি এসব ভুলে যেতে ইচ্ছে করে।

সুব্রত মুখার্জি ঃ
মাঠে গিয়ে শিক্ষাও পাই

পরে যিনি পুলিশ মন্ত্রীও হয়েছিলেন সেই সুব্রত মুখার্জি ছেলেবেলায় বাটানগর থেকে কলকাতার ঘেরা মাঠে ঢোকার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে পুলিশের তাড়াও খেয়েছেন।

সুব্রতবাবু আসতেন ভোরের ফার্স্ট ট্রেনে। দল বেঁধে। বাড়ির কথা না শুনেই। তারপর ইঁট পেতে জায়গা রেখে, ধাক্কা খেয়ে, ধাক্কা দিয়ে শেষমেষ মাঠে ঢুকতেন। গ্যালারিতে বসে দু' চোখ ভরে খেলা দেখতেন।

প্রবাসী বাঙালী বলে শ্রীমুখার্জিকে সকলে বাঙাল ডাকতেন। তাই তিনি ইস্টবেঙ্গলের ভক্ত হয়ে উঠেন। কিন্তু পরে কলকাতায় এসে মোহনবাগানের সমর্থক হয়ে যান।

সুব্রতবাবু বর্তমানে ইস্টবেঙ্গলের সদস্য। ক্লাবের নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামান। তার রাজনৈতিক কর্মীদের অধিকাংশ ইস্টবেঙ্গলের অন্ধ সমর্থক। তাই এ দল জিতলে তিনি পতাকা তোলেন, মিষ্টি খান।

কিন্তু মোহনবাগান জয়ী হলে মনের ভেতরটা আনন্দে মোচড় দিয়ে ওঠে। অবশ্য হৈ চৈ করেন না। হারলে মনটা মুষড়ে পড়ে।

নিজে রেগুলার ফুটবল খেলেছেন। গ্রামে। বঙ্গবাসী কলেজেও। রাজনীতিতে যিনি স্ট্রাইকার, খেলার পজিসনে তিনি কিন্তু


সুব্রত মুখার্জি

ডিফেন্সে।

ফুটবলের পর তার প্রিয় খেলা টেবল টেনিস। ক্রিকেট তিনি ঘৃণা করেন। ক্ষমতা থাকলে আইন করে এ খেলা তুলে দিতেন।

শ্রীমুখার্জি সুরজিৎ সেনগুপ্তের খেলার ভক্ত। তবে হাবিব, গৌতম, সুব্রতের খেলাও ভাল লাগে। শুধু মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল নয়, তিনি মহমেডান স্পোর্টিং-এর খেলাও দেখতে যান।

কংগ্রেস আমলে মন্ত্রী থাকার সময় ক্যাবিনেট মিটিং ফাঁকি দিয়েও মাঠে যেতেন। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় বুঝেও কিছু বলতেন না।

বর্তমানে গদিতে না থেকেও তিনি খেলা দেখার সময় পাচ্ছেন কম। সংগঠনেই সময় কাবার। মাঠে যেতে না পারলে আগের মত মন খারাপ হয়ে যায়।

তার মতে, টিকিটের টাকা সরকারী কোষাগারে যায়। অথচ কোনো সরকারই খেলার মাঠে নজর দেননি। দিচ্ছেনও না।

তবে টাকা দিয়ে যেভাবে বাইরে থেকে প্লেয়ার আমদানী করা হচ্ছে তাতে তিনি ক্ষুব্ধ। এতে বহু লোকাল খেলোয়াড়কে সারা বছর মাঠের ধারে কাটাতে হবে। ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। এটা শুরু করে মোহনবাগানই।

নিয়মিত খেলার মাঠে যান বলেই সুব্রতবাবু অবাক হয়ে দেখেন, মাঠে এত দুর্ভোগের মধ্যেও দর্শকরা সব সহ্য করে। খেলা আছে বলে অন্য অসভ্যতা নেই। মাঠে গিয়ে শুধু খেলা দেখাই নয়, শ্রীমুখার্জি শিক্ষাও নেন।

প্রদীপ ভট্টাচার্য : মনটা আঁকুপাঁকু করে

প্রিয় দল জিতলে প্রাক্তন মন্ত্রী প্রদীপ ভট্টাচার্যের নিজের ইলেকশন জেতার মতো আনন্দ হয়। হারলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। প্রদীপবাবু ইস্টবেঙ্গলের হানড্রেড পারসেণ্ট সমর্থক। আগাগোড়া। বাড়িতে সকলেই এ দলের ভক্ত নন। দাদা মোহনবাগান।

উনি নিজেও খেলতেন। স্ট্রাইকার। প্রিয় খেলোয়াড় ছিলেন বলরাম। এখন মিহির বসু, প্রদীপ চৌধুরী, সুব্রত ভট্টাচার্য।

প্রদীপবাবু বীরভূমের ছেলে। কলকাতার ঘেরা মাঠে প্রথম খেলা দেখেন ৬৩—৬৪ সালে। ইস্টবেঙ্গল—মোহনবাগান। বয়স তখন আঠারো। সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের জেনারেল সেক্রেটারি। বন্ধুর মারফৎ টিকিট পান। লাইন দিয়ে জীবনে কখনো মাঠে ঢোকেননি।

মন্ত্রী হয়ে তার মাঠে যেতে অসুবিধা হয়নি। তিনি মেথডিক্যাল। কোন দলের খেলা কবে তা আগে ডায়েরিতে টুকে নিতেন। তারপর প্রোগ্রাম করতেন। কোনোদিন যেতে না পারলে কানে ট্রানজিস্টার লাগিয়ে রাখতেন।

সে সময় মন্ত্রীদের মধ্যে মাঠে যেতেন প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, ফজলে হক, সুব্রত মুখার্জি, ডাঃ গোপাল দাস নাগ। হাসি তামাশা হতো।

ক্যাবিনেট মিটিং-এ প্রায়ই খেলার কথা উঠতো। ফ্লাড লাইট নিয়ে আধ ঘণ্টা বির্তক এখনো ভোলেননি। তিনি একা ইস্ট-বেঙ্গলের হয়ে লড়েছিলেন। গোপাল নাগ, প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, সুব্রত মুখার্জি এমনকি সিদ্ধার্থ রায়ও অন্যদিকে।

এবছর মরশুম শুরুর দু'হপ্তা পর্যন্ত এক দিনও মাঠে যেতে পারেননি। দলের কাজে দারুণ চাপ। মাঠে যাবার প্রোগ্রাম ঠিক রাখা যাচ্ছে না। তাই ভোরে খবরের কাগজ পেলেই এখন প্রথমেই খেলার পাতায় নজর দেন।

এবার তিনি মাঠে যাবার সময় করে নেবেনই। কেননা মনটা বড়ো আঁকুপাঁকু করে। তবে কোনো ক্লাবের তিনি কার্ড হোল্ডার নন বলে চট করে টিকিট হাতে পান না।


প্রদীপ ভট্টাচার্য

ছড়রা

নিতাই ঘোষ



আসছে আবার সেই দিনটি
ভাবছে খেলার 'মাঠ'
করবে বুকে দাপা-দাপি
ভয়েই শরীর কাঠ।

খেলবে আমার বুকে চড়ে
মারবে বুটের লাথি,
গ্যালারিতে দর্শকেরা
করবে হাতা-হাতি

ইঁট পাটকেল ছুঁড়বে গায়ে
মারবে ছুঁড়ে পট্‌কা।
বাজখাঁই সব চিৎকারেতে
লাগবে কানে খট্‌কা।

হারা-জেতা চাই না বাবা
ড্র-টা হলেই বাঁচি,
নইলে ওরা দামাল ছেলে
চালিয়ে দেবে কাঁচি।

ছবি : নিউজ ফটো এজেন্সী

দল হিসেবে আসাম ছিল সবার সেরা

বোম্বাই থেকে আর শঙ্করণ

বোম্বাইতে ফিরে এসে মনে হয়েছে যে গৌহাটিতে ফেডারেশন কাপের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সাব-জুনিয়র প্রতিযোগিতাটি নিয়ে একটা আলোচনা হওয়া উচিত। পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব না হলেও প্রতিযোগিতার যে উজ্জ্বল দিকটি রয়েছে সেটা নিয়ে নানা কারণে সংবাদপত্রে আলোচনা সম্ভব হয়নি। অথচ সাব-জুনিয়রদের সম্পর্কে নজর না দিলে আগামী দিনে ভারতের ফুটবল যে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়বে তা বলা বহুলা।

এবারে সারা ভারত থেকে ১৫ বছরের অনুর্ধ বারোটি রাজ্য দল এসেছিল। আমার চোখে আসাম শুধু চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বলে নয়, দল হিসেবে তারা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে।

সাব-জুনিয়রে তারা শ্রেষ্ঠ দলরূপে জয়ী হয়ে নিজের রাজ্যকে বলতে গেলে 'প্রথম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্মান এনে দিল। কারণ একথা বললে অন্যায় হবে না যে এ পর্যন্ত আসামের ফুটবল দল, কি সিনিয়র কি জুনিয়র, কোন ফাইনালে খেলার যোগ্যতা দেখাতে

কোচ লতিফ সহ সাব-জুনিয়র চ্যাম্পিয়ান আসাম দল / লক্ষ্মণ পোদ্দার



করতে শিখেছে।

আসামের কাছে ত্রিপুরা চার গোলে হারে। এরপর 'ডি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ওড়িশা পর্যুদস্ত হয় আসামের কাছে। আসাম ও বাংলার মধ্যে সেমিফাইনাল হয়। বাংলার ছেলেরা 'বি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয় আগাগোড়া ভাল খেলেই এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দলদের হটিয়ে দিয়ে। গ্রুপে অন্ধ্রের সঙ্গে খেলায় বাংলার জয় অবশ্য কিছুটা ভাগ্যপ্রসূত। গোলকিপার আরিফ একটি অসাধারণ সট আটকাতে গিয়ে

ইসলামের দ্বিতীয় গোলটি ছিল অনবদ্য। বাঁদিক থেকে উড়ে আসা বলের সে দিক পরিবর্তন করে দেয়। সাংমা তৃতীয় গোলটি করে। অথচ প্রথমার্ধে গতবারের বিজয়ী কর্ণাটক সমানভাবে লড়াই চালায়।

কর্ণাটক দল অবশ্য পূর্ণ শক্তি নিয়ে খেলতে পারেনি এই অভিযোগ উঠেছে। কারণ তাদের কয়েকজন খেলোয়াড়কে বয়সের অজুহাতে খেলতে দেওয়া হয়নি। আসামের ছেলেরা সেখানে ডাক্তারদের ছাড়পত্র পেয়েছে

পারেনি। কাজেই সাব-জুনিয়ররা মীর ইকবাল হুসেইন ট্রফি জয় করে এনে আসামের ফুটবলে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

আসামের ডিফেন্সে ইমদাদখান ছিল শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। লিঙ্কম্যান অথবা মধ্যবিভাগে বাহারুল ইসলাম, উইং ফরোয়ার্ডের মধ্যে রোমিন সাংগমা, স্যানেন ম্যাসারা এবং স্ট্রাইকারদের মধ্যে জয়ন্ত কুমার, খগেন গোগোই এবং সরিফ আলম মনে রাখার মত ফুটবল খেলেছে। দলের মধ্যে যেমন সংহতি ছিল তেমনি ছিল দ্রুততালে খেলার ক্ষমতা। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই বয়সেই তারা নিজের জায়গায় অথবা জোনে খেলার দায়িত্ব গ্রহণ



বিজয়ী আসাম দলের অধিনায়ক লোহিত গগৈ নুরুল আমিনের হাত থেকে ট্রফি নিচ্ছে / লক্ষ্মণ পোদ্দার

বগলের তলা দিয়ে বলটি গলিয়ে দেয়। অথচ সটটি সোজা আসছিল। কিন্তু বাংলা কেরালাকে যখন ৩—০ গোলে হারল তখন দলটির শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই স্বীকার করে নিলেন। বিশেষ করে সুব্রত শীলের দেওয়া দ্বিতীয় গোলটি। সুব্রত বিপক্ষের মাথা থেকে আসা বলটি হাফ ভলি করে গোলে পাঠায়। উপস্থিত বুদ্ধির একটি ভাল দৃষ্টান্ত।

তবে আসামের বিপক্ষে বাংলার ছেলেরা নিজেদের গোল আটকাতে ব্যস্ত হয়েছিল। আর অন্যদিকে আসামের ছেলেরা সুযোগের পর সুযোগ নষ্ট করতে থাকে। বাংলার অধিনায়ক ভাস্কর চক্রবর্তী, সুকান্ত পাল, সুব্রত শীল, শোভন দত্ত, কবীর বসু এবং গোলকিপার কৈলাশ গুরুং খুব ভাল খেলে।

কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে জয়ন্ত কুমার আসাম দলে যোগ দেওয়ার পর খেলার চেহারা পাল্টে যায়। প্রথম গোলটি মূলত সাংমা করে তারই চেষ্টাতে। জয়ন্ত সারাক্ষণ আক্রমণের উৎস ছিল। দ্বিতীয় গোলটি করে ম্যাসারা খেলা শেষ হওয়ার দু'মিনিট আগে।

ফাইনালে জয়ন্তের চেয়ে খগেন গোগোই ছিল আরও ভাল। কর্ণাটকের সঙ্গে ফাইনালে আসামের ছেলেরা জয় পায় দ্বিতীয়ার্ধের দু মিনিটের প্রথম গোল হওয়ার সুবাদে। জয়ন্ত কুমার গোল করে। এরপর বাহারুল

বিনা বাধায়। তবে যারা অভিযোগ করেছিল তারা নিজেরাও দোষমুক্ত ছিল না।

কর্ণাটককে ফাইনালে আসার আগে ভালরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষ করে রাজস্থান ও রেল দলের বিপক্ষে। দুটি দলই 'অভিজ্ঞতা সম্পন্ন' ছিল বলা যায়। কর্ণাটক গোলের গড়পড়তায় সেমিফাইনালে যায়।

সেমিফাইনালে কর্ণাটক-উত্তরপ্রদেশ ম্যাচটি ছিল প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ খেলা। পাঁচজন খেলোয়াড়ের বয়স বেশীর অভিযোগে হরিয়ানাকে স্ক্র্যাচ করে দেওয়া হয় এবং উত্তরপ্রদেশ সেমিফাইনালে যায়। উত্তরপ্রদেশ ভাল খেলে হারে তাদের দক্ষ গোলকিপার অনিল কুমার বানুধার সামান্য ভুলে। গোল ছেড়ে আগে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণাটকের স্ট্রাইকার ও অধিনায়ক সাত্তার বলটি উঁচু করে গোলে পাঠায়। উত্তরপ্রদেশ গ্রুপের খেলায় হরিয়ানার কাছে ৩—২ গোলে হারে। মণিপুরের সঙ্গে ড্র করে। অন্য কয়েকটি দলের খেলোয়াড়ের মধ্যে অন্ধ্রের প্রেমসাগর আমার চোখে পড়েছে।

আগের দুবারের তুলনায় এবার প্রতিযোগিতার মান অনেক উঁচুতে ছিল। তবে বয়সের ব্যাপারটা এখনও একটা সমস্যা। এব্যাপারে এবারের টুর্নামেন্ট কমিটিকে অনেক অভিযোগ শুনতে হয়েছে। ●

ফেডারেশন কাপের অর্থ ঘাটতির ধাক্কার পর আগামী বরদলুই নিয়ে ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুধু গোহাটি নয়, গোটা আসামেই এখন কচকচি শোনা যায় সদ্য অনুষ্ঠিত তৃতীয় ফেডারেশন কাপের আর্থিক ক্ষতি এবং দর্শকদের গরহাজির থাকার ব্যাপারগুলো ঘিরে। কলকাতার দলগুলো 'না' বলার পরে পরেই টুর্নামেন্ট কমিটির কর্তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্থানীয় লোকজনকে উৎসাহিত করতে যাতে তারা মাঠে হাজির হয়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, প্রচারপত্র বিলি মারফতে বহু চেষ্টা করেও টুর্নামেন্টের ২/৩টা খেলা ছাড়া স্টেডিয়ামের গ্যালারি ছিল বহুলাংশে ফাঁকা। প্রথম ফাইনালে লোক জড়ো হয়েছিল হাজার বিশেক। এটাই সর্বাধিক সংখ্যা। সর্বমোট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

গোড়ায় কথা ছিল টুর্নামেন্টে যা লাভ হবে তার আধাআধি বখরা হবে আসাম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ও গৌহাটি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে। সবশেষে লাভ তো দূরের কথা লক্ষ লক্ষ টাকা ঘাটতি জেনে স্টিয়ারিং কমিটির কর্তারা ফাঁপরে পড়লেন এবং সব ঝক্কির জন্য দায় চাপালেন নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের কর্তা নুরুল আমিনের উপরে।

আমিন সাহেব তার আগেই বিপদে পড়েছিলেন। ফেডারেশন সম্পাদক বিজয়রঙ্গমের সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াই বেধে যাওয়ায়। বিজয়রঙ্গম ওদিকে গোঁ ধরেছিলেন—দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি টুর্নামেন্ট চালাতে। ওই টুনামেন্টগুলোর দিন তারিখ ঠিক হয়েছিল গোহাটিতে ফেডারেশন কাপ শুরু হবার আগে এবং পরে। এই ব্যাপারটা ফেডারেশনের নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল।

ফেডারেশন সভাপতি নুরুল আমিনের লক্ষ্য পথে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন সম্পাদক বিজয়রঙ্গম। আশঙ্কা ছিল পশ্চিম ভারত, পাঞ্জাব ও দক্ষিণের সেরা দলগুলো অনেক টুর্নামেন্টের ঝামেলা থেকে রেহাই পেতে হয়তো গোহাটির ফেডারেশন কাপই বয়কট করবে। কিন্তু নুরুল আমিনের তড়িঘড়ি প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তা হতে পারেনি। তা সত্ত্বেও কিন্তু স্টিয়ারিং কমিটি গোহাটির নেহরু স্টেডিয়ামে লোকজন জড়ো করতে পারেনি। নুরুল আমিন শেষদিন পর্যন্ত তার ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যস্ত ছিলেন যাতে প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে উৎরে যায়।

নিজস্ব ক্ষমতা বলে নুরুল আমিন নিঃশব্দে সম্পাদক বিজয়রঙ্গমকে এড়িয়ে গিয়ে ফেডারেশনের অন্য সব কর্মকর্তা, এবং দেশের বড় বড় কয়েকটি ক্লাবকে নানারকম নির্দেশ বা অনুরোধ জানিয়েছিলেন।



বি এস এফ : জে সি টি-র খেলায় রেফারি উৎপল ভট্টাচার্য বল হাতে নিয়ে অবস্থা সামাল দেবার চেষ্টা করছে/লক্ষ্মণ পোদ্দার



জে সি টি : বি এস এফের খেলায় জে সি টি-র অশোক বলের নাগাল পেতে চাইছে, বাঁদিকে রবীন্দ্র, ডানদিকে যোগীন্দ্র/লক্ষ্মণ পোদ্দার

টি ও আবদুল্লা দক্ষিণের মানুষ। ফেডারেশনে দীর্ঘদিন আছেন। এখন সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান। নুরুল আমিন তাকেই বেছে নিলেন দক্ষিণের টুর্নামেন্টগুলোর জন্যে জবাবদিহি করতে। ২৬ এপ্রিল আমিন সাহেব তার পাঠালেন আবদুল্লাকে এইভাবে :

'ইওর টেলিগ্রাম স্ট্যাফোর্ড এ্যাণ্ড আদার সাউথ ইণ্ডিয়ান টুর্নামেন্ট স্যাঙ্কশণ্ড এ্যাণ্ড হেল্ড ডিউরিং ফেডারেশন কাপ পিরিয়ড ভায়োলেটেড ফেডারেশন রুলস। ফেডারেশন কাপ হ্যাজ বিন ডিজরাপটেড নিয়ারলি রেকর্ড। গিভ ইওর ওন জাজমেন্ট অন সিচুয়েশন ইফ টিমস ফেইল টু কাম অ্যাকোর্ডিং টু ফিকশ্চার এ্যাণ্ড এবাউট ভাওলেশন অব রুলস।'

আবদুল্লা কি জবাব দিয়েছিলেন নুরুল আমিনকে, তা হাতে-পাওয়া যায়নি। জানা যায়নি যে আবদুল্লা ওই তার পেয়ে সেটা বিজয়রঙ্গমকে দেখিয়েছিলেন বা আলোচনা করেছিলেন কিনা!

শুধু কেবল ফেডারেশনের কর্মকর্তাই নয় দেশের যেসব বড় বড় দল দক্ষিণের টুর্নামেন্টগুলোতে অংশ নিয়েছিল তাদেরকেও নুরুল আমিন তার পাঠিয়েছিলেন যাতে তার কাজকর্মে গলদ না থাকে। এইরকম একটা তার পাঠানো হয়েছিল গোয়ার ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের কাছে। 'ইওর টেলিগ্রাম স্ট্যাফোর্ড কাপ হেলড ডিউরিং ফেডারেশন কাপ পিরিয়ড ভায়োলেন্টেড ফেডারেশন রুলস। ইউ হ্যাভ টু ফলো ফেডারেশন কাপ ফিকশ্চার।'

ডেম্পো পরে ফেডারেশন কাপে যোগ দিয়েছিল।

এতসব কাণ্ড সত্ত্বেও গোহাটি শহর এবং তার আশপাশের হাজার হাজার ফুটবল প্রিয় মানুষ নীরবে, নিঃশব্দে অদ্ভুতভাবে বয়কট করল ফেডারেশন কাপের খেলাগুলো। অথচ বয়কটের জন্য কিন্তু আগেভাগে কোনো প্রচারও ছিল না।

একটা বিষয় এবারে পরিষ্কার হয়েছে—যে বরদলুই ট্রফির গণ্ডগোল এবং এক শ্রেণীর দর্শকদের ফেডারেশন কাপ বয়কটের পরে জি এস এ কর্তাদের হুঁশ এসেছে। তারা বুঝতে পারছেন এভাবে চললে

ভবিষ্যতে এখানকার প্রতিযোগিতাগুলো বিস্মৃতির গহ্বরের দিকে এগুবে।

গৌহাটির ক্রীড়া সংস্থাগুলির কয়েকজন কর্মকর্তা নিজেদের স্বার্থ রক্ষাতেই ব্যস্ত। খেলাধূলা নিয়ে এদের এতটা মাথাব্যথা নেই যতটা আছে নিজের পরিচয় জাহির করার চেষ্টায়। এমন লোকও আছেন যারা খেলাধূলাকে মূলধন করে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। দু'একজন কর্মকর্তাতো প্রকাশ্যে খেলাধূলার মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গিয়ে আদতে এখানকার খেলাধূলারই সর্বনাশ করছেন।

এসব কথা শুধু আমারই নয়। গৌহাটি থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক ক্রীড়া পত্রিকা 'অভিরুচি'-তে ওখানকার এক সাংবাদিক অরুণ চন্দ্র বড়ুয়া 'আসামে খেলার উন্নতিতে বাধা কোথায়' এই শিরোনামের এক নিবন্ধে লিখেছেন 'আসামের খেলাধূলার জগতে এমন কম লোকই পাওয়া যাবে যারা প্রকৃতই খেলাধূলার উন্নতির চিন্তা করেন। বেশ কিছু কর্মকর্তা খেলার মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় জনসাধারণকে জাহির করে এম এল এ অথবা এম পি হবার বাসনায় নয়তো খেলার মাধ্যমে মন্ত্রীগণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেদের ব্যবসার সুবিধা করার আশাতেই এসেছেন। এইসব ব্যক্তি খেলাধূলার জগতে আসেন বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাগুলির আর্থিক অনটনের সুযোগ নিয়ে, পরে এরাই খেলোয়াড়দের ভাগ্যবিধাতা হয়ে যান।'

গৌহাটি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের বেশ কিছু অক্লান্ত কর্মী বছরের পর বছর যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বরদলুই প্রতিযোগিতা ভারতে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পেয়েছে তারা এই মুহূর্তে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। চিন্তাটা প্রকট হয়েছে তারা খেলাধূলাকে ভালোবাসেন, খেলাটাকে ওখানে জিইয়ে রাখতে চান বলেই।

এইসব চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয়েছে যে, জি এস এ বা অন্যান্য ক্রীড়া সংগঠনে বাজে ধরনের লোকজনকে উৎখাত করে সেখানকার খেলাধূলাকে এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ চাঙ্গা করতে তৎপর হওয়া দরকার।

ফেডারেশন কাপের নানা ঝামেলার মধ্যেও জি এস এ'র কয়েক জন কর্মকর্তা মাথায় রেখেছেন আগামীবারের বরদলুই প্রতিযোগিতার সাফল্যের চিন্তাভাবনা। ফি বছরেই জি এস এ'র যে কর্মকর্তাটি কলকাতার দলগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন তিনি মস্ত সুবিধা পেয়েছেন ফেডারেশন কাপের প্রতি-যোগিতা চলাকালেই। ভারতের প্রায় সব নামী দলগুলোর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন আগামী বরদলুই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে। শুধু তাই নয় ওই কর্মকর্তার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছিল দিল্লি ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার জনৈক কর্মকর্তার সঙ্গেও। জানা গেছে যে, ডি সি এম-এ রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, ইরাক, দক্ষিণ কোরিয়া, কোয়ায়েত, মালয়েশিয়া থেকে যে সব বিদেশী দল এবারে খেলতে আসবে। জি এস এ'র ওই কর্মকর্তাটি ডি সি এম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন যাতে বিদেশী কিছু দল বরদলুই প্রতি-যোগিতাতেও খেলতে পারে। এতে খরচপত্রও কম পড়বে। এইসব ব্যবস্থা এখানকার জনমানসে নতুন করে উৎসাহ যোগাবে সন্দেহ নেই।

কানাঘুষায় এও জানা যাচ্ছে যে কলকাতার দলগুলোর সঙ্গে জি এস এ'র সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উপায় নিয়েও অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করছেন।







গ্রামের গন্ধ গায়ে মাখা বিদেশ

কে যেন সেদিন ব লে, বিদেশের গায়ে 'গ্রামে
গন্ধ'। কথাটা বিদেশের ভাল লাগে। সে গ্রামের ছেলে
সুযোগ পেলেই ছুটে যায় নিজের গ্রামের বাড়ি
—কেশবপুরে, বাগনাপাড়া থেকে কম দূর নয়। বাড়ি
গিয়ে সে দীঘির মত বড় তাঁতীপুকুরে জাল ফে
বাঁশের তৈরি ঘাটে বসে প ভরে স্নান করে গ্রামে
গন্ধটাকে গায়ে স্থায়ী করতে চায়। ও তখন ভুলে য
ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের (ভবানীপুর) কর্মী, বহু 'ফ্যান'
সারা দেশে। দাদাদের সঙ্গে ওর বন্ধু ও গুরুর সম্পর্ক
বৌদিরা, 'অমন হয় না'। ১৯৫৩ সালে মুর্শিদাবা
মামাবাড়িতে ওর জন্ম—গোপাল ওর আদরের নাম
বাবা জিতেন্দ্রমোহন বসুর বয়স হয়েছে। এক সু
পরিবারের তিনি কর্তা। ছেলেরা গ্রামকে ভালবা
গ্রাম-ছাড়া হতে তারা কষ্ট পায়, মনে পড়ে '৭০ সা
জেলা (চুঁচুড়া) দলের হয়ে গোপাল খেলতে গে
মা ননীবালা কেঁদে-কেটে অনর্থ বাধিয়েছিলেন।

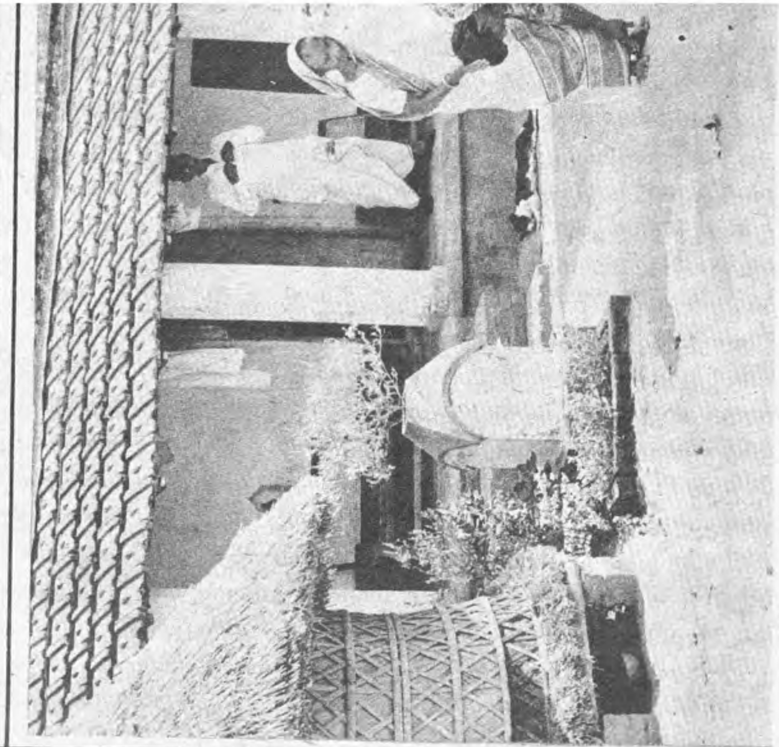
গোপাল তার খেলা নিয়ে তেমন কিছু বলতে চায়
—সে অনেক দেরী। তবে ওর মতে দাদারা যদি গ্রামে
মায়া কাটাতে পারতেন, তবে ওরা অনায়াসে কলকা
মাঠে খেলে নাম করতেন।

তবে বাড়ি গিয়ে গোপাল খেলা নিয়ে ভাব
নারাজ। লাজুক স্বভাবের গোপাল তখ সবার ক
থেকে আদর কেড়ে নেয়, বৌদি, মা ওদে
বসে, কখনও বা বাবা ও দাদার পাল্লায় সারি
আলোচনাও করে। কিন্তু এতো দীর্ঘস্থায়ী
মায়ের আশীর্বাদ ও বন্ধুত্বয় মাথায় নিয়ে তার ভালবা
—ওই গ্রাম্য-বাড়িটাকে ছেড়ে পথে নেমে যেতে
—উদ্দেশ্য রয়েড স্ট্রিটের অস্থায়ী আবাস, ভবানীপুরে
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং কলকাতার গড়ের মাঠ—।

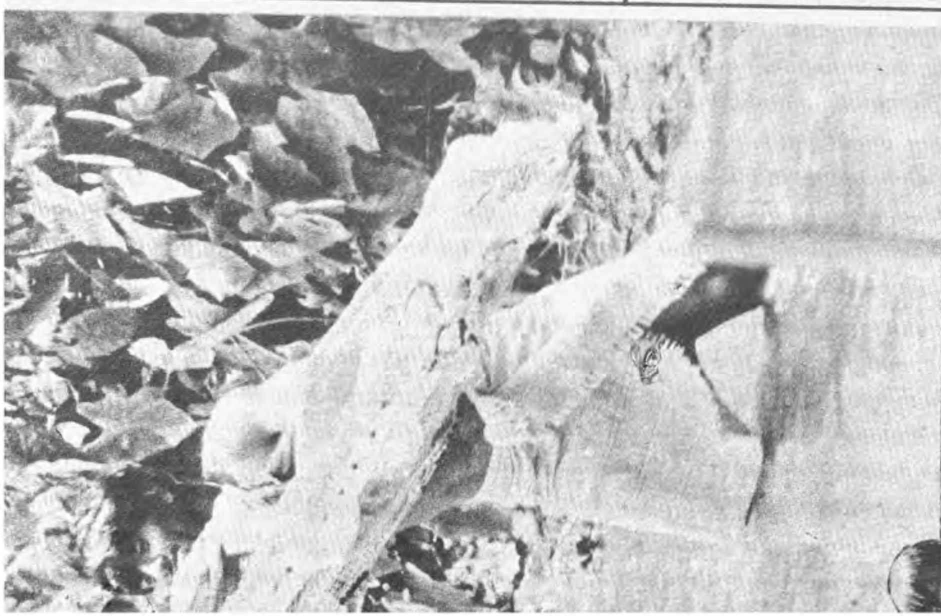




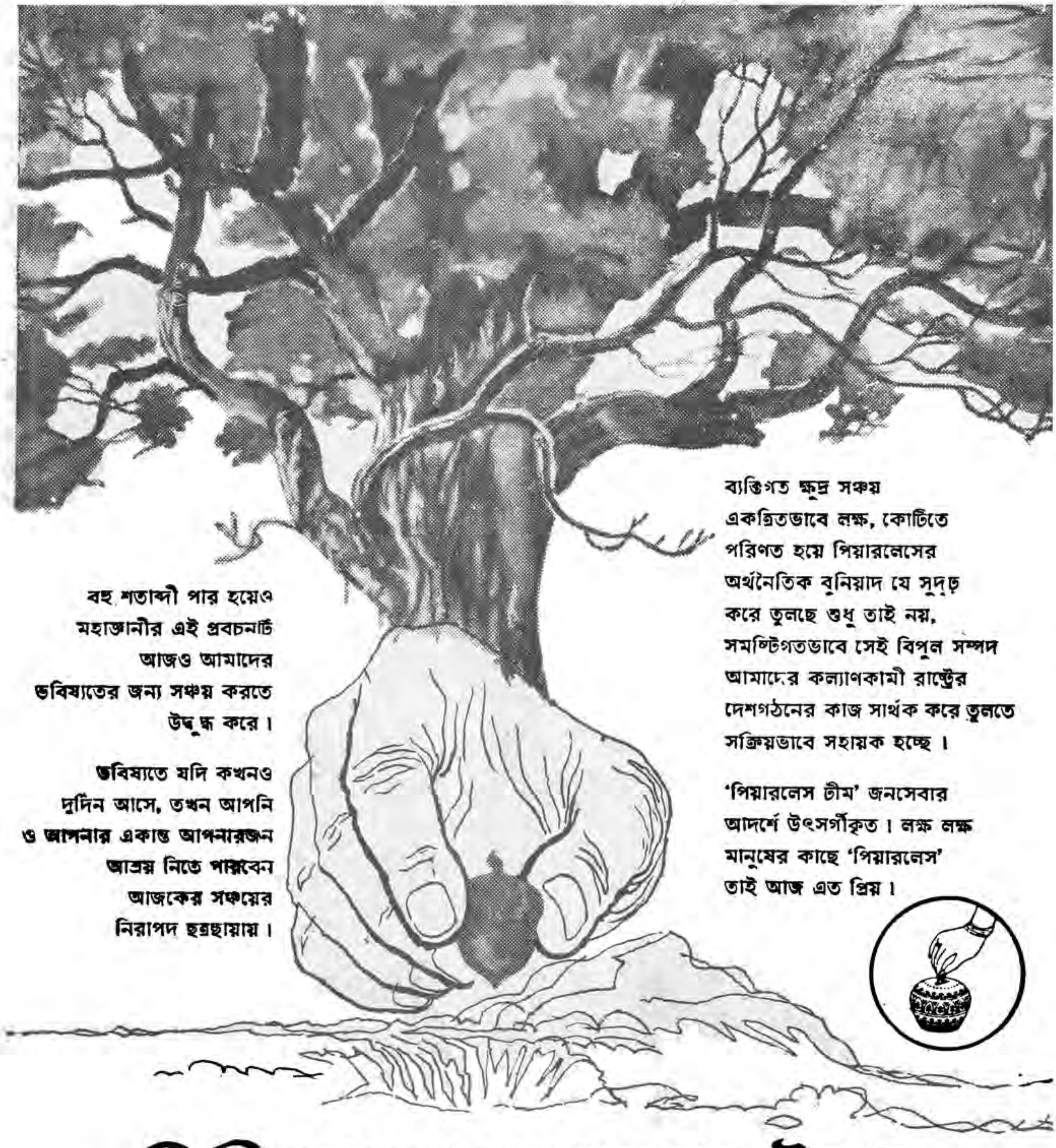



ছবি ঃ অরুণ মুখার্জি







কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ মোহনবাগান ক্লাবের একটি দিগন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব-বাংলার মানুষ মোহনবাগান ক্লাবের সদস্য, সমর্থক অথবা কর্মকর্তা এখন আর বড় একটা দেখা যায় না, যেমন দেখা যায় না ইস্টবেঙ্গলে। কিন্তু দীর্ঘ সতেরো বছর সেই মোহনবাগানের সর্বোচ্চ কর্মকর্তার পদে আসীন অবস্থায় যিনি ৭ জুন আমাদের মায়া কাটিয়ে পরপারে চলে গেলেন, তিনি কিন্তু ওপার বাংলার মানুষ। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ঢাকার ভাগ্যকূলেই থাকতেন কিন্তু তখনও মোহনবাগান ক্লাবের সদস্য। শুধু সদস্য নয়, উল্লেখযোগ্য সদস্য এবং কর্মকর্তাও।

কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় ভাগ্যকূলের রাজা জানকী রায়ের শেষ সন্তান। কলকাতায় শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে বাল্যকালেই তিনি মোহনবাগান ক্লাব সম্পর্কে আকর্ষিত হন। প্রায় জন্মলগ্নেই তরুণ কুমার সাহেব মোহনবাগান ক্লাবের সদস্য হন। যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বে বেশির ভাগ সময় তাকে কলকাতার বাইরে কাটাতে হতো বটে, কিন্তু কলকাতা এলেই বিকেলে ক্লাব হয়ে গঙ্গার পাড়ে বেড়াতে যাওয়া ছিল নিত্য-অভ্যাস।

আগেকার দিনের রাজা-মহারাজাদের কাছে মেজাজটাই ছিল যেমন আসল রাজা, তেমনি রমেনবাবুর ক্ষেত্রেও তাই। এমন সৌখীন, দিলদরিয়া মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। যখন থেকে তার হাতে আর্থিক ক্ষমতা এসেছে, মোহনবাগান ক্লাব কখনোই বিমুখ হয়নি। উমাপতি কুমার বলেন, ডুরাণ্ড খেলতে যাচ্ছি, ক্লাব তিন হাজার টাকা দিয়েছে। এর মধ্যেই ফিরে আসতে হবে। আমরা জানতাম ক্লাব ফাণ্ড আর ভাঙ্গা হবে না। অবশ্য এর মধ্যেই চলবার চেষ্টা করতাম আমরা। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর রেল কামরায় গাদাগাদি করে গিয়েও এবং সমস্ত রকম বাহুল্য বর্জন করেও কোন কোন সময় এর বেশী ব্যয় হয়ে গেল। রমেনবাবু বাকিটুকু মিটিয়ে দিলেন।

ক্লাবের সুনামের জন্য কুমার সাহেব সদা উৎকণ্ঠিত থাকতেন। সম্প্রতি ডুরাণ্ডে মোহনবাগান হারার পরদিন ভোরবেলা কুমার সাহেব সাধারণ সম্পাদককে ফোন করে বললেন, 'ধীরেন! পত্রিকা দেখেছো।' ধীরেনবাবু একটু বিরক্তিভরে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, টিম হেরেছে।' অপর প্রান্ত থেকে বেশ ধমকের সুর ভেসে এলো, 'হারটাই বড় হল! টিমের যে দুর্নাম হয়েছে, খেলোয়াড়রা কি সব অশালীন আচরণ করেছে। এসব কী? হার-জিৎ তো আছেই।' ধীরেনবাবুর নিরুত্তাপ উত্তর, 'দেখছি।' 'এখনও দেখোনি, দেখছি? ঝনাৎ করে ফোনটা রেখে দিয়েছিলেন রমেনবাবু।

গত কয়েকবছর আগে মোহনবাগান যখন বছরের পর বছর কিছুতেই লিগ পাচ্ছিল না, সদস্য গ্যালারি থেকে প্রায়শই কর্মকর্তাদের বাপান্ত হতো, টেণ্টে ইস্টকবর্ষণ চলতো সেই সময় রমেনবাবু তার প্রিয়জনদের বলেছিলেন, যেমন করে পারো পুলিশ, মন্ত্রী সবাইকে ধরে, এই অশোভন ব্যাপারটা বন্ধ করাও।

ক্লাবের জয় নিয়ে যেমন তিনি মাথা ঘামাতেন, শেষ বয়সে ক্লাবের সুনাম রক্ষায় তাকে অনেক বেশী চিন্তান্বিত হতে দেখা যেতো। ক্লাবের জয় নিয়েও যে রমেনবাবু একদা উদগ্রীব ছিলেন, সে গল্প শুনলাম ওর স্নেহের পাত্র প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। প্রফুল্লবাবুরা কালিঘাটের প্রধান পূজারী। সে ১৯৩৯ সালের কথা। প্রফুল্লবাবুকে ডেকে রমেনবাবু বললেন, 'প্রফুল্ল,মাকে একটু ভালো করে ডাকো দেখি, যেভাবেই হোক টিমকে এবার লিগ পাওয়াতেই হবে।' তার কথায় বেশ ঘটা করে মায়ের পুজো হলো, অবশ্যই ব্যয়ভারও তাঁরই। আশ্চর্য ঘটনা, মোহনবাগান সেবার অনেক বাধা (বিশেষ করে তার আগের পাঁচ বছরের রেকর্ডধারী চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং ও পড়শী ইস্টবেঙ্গল) অতিক্রম করে লিগ চ্যাম্পিয়ন হল। ১৯১১ তে আই এফ এ শিল্ড বিজয়ের পর এতো বড় সম্মান পাওয়ার পর সে এক বিরাট ধুমধামের ব্যাপার। সে উৎসবের বড় হোতা কুমার সাহেব।

এই তো সেদিনের কথা। ১৯৭৬ এ মোহনবাগান লিগ, শিল্ড, রোভার্স ও ডুরাণ্ড জয়ের অনন্য সম্মান অর্জন করার পরই সমস্ত খেলোয়াড়দের সঙ্গে ফটো তুলেছিলেন, যে ফটো তার নিত্যকার বসার চেয়ারটির সামনে টাঙ্গানো থাকতো। নিজের জাহাজ দিয়ে খেলোয়াড়দের নৌবিহার করালেন। ভূরি-ভোজন তো আছেই।

মোহনবাগান ক্লাব কুমারসাহেবের কাছে নিশ্চয়ই বহু বিষয়ে কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু ক্লাবের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা সভাপতি পদে তার আসীন হওয়াটা নিতান্তই কাকতালীয়। তার আগে মোহনবাগান ক্লাবে সর্বাধিক বয়োকনিষ্ঠ সভাপতি ছিলেন স্যার ধীরেন মুখার্জি। এই ক্লাবের ট্রাডিশন হল, সভাপতি আমৃত্যু পদে আসীন থাকেন। সেক্ষেত্রে স্যার ধীরেনের পর রমেনবাবু কবে সভাপতি হতেন! কিন্তু ঘটনাক্রমে ১৯৬২ সালে মোহনবাগান তৎকালীন এ আই এফ এফ সভাপতি মনীন্দ্র দত্তরায় (বেচুবাবু)-এর টিম স্পোর্টিং ইউনিয়নকে নেমে যাওয়া থেকে বাঁচাতে মোহনবাগান ৩-০ গোলে হারলো। খবরের কাগজে ঢিঢি পড়ে গেল। স্যার ধীরেন অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে রাগারাগি করে পদত্যাগ করলেন। অনেক অনুরোধ উপরোধেও স্যার ধীরেন অনড়। ফলে সে পদে নির্বাচিত হলেন কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়।

এই মেজাজী মানুষটির শেষ সময় খুব সুখের নয়। বিশেষ করে বছর দেড়েক আগে স্ত্রী বিয়োগ হবার পর তিনি ছিলেন একান্তই নিঃসঙ্গ। শেষ বয়সে তিনি শোভাবাজারের রাজবাড়ি ছেড়ে পার্ক-সার্কাসের নতুন বাড়িতে উঠে আসতে বাধ্য হন।

মোহনবাগান ক্লাব ৯ জুন একটি শোক সভার আয়োজন করে। উমাপতি কুমারের সভাপতিত্বে এই সভায় কমল বসু (স্পোর্টস কাউন্সিল) অশোক ঘোষ (আই এফ এ সম্পাদক) ধীরেন দে প্রমুখ তার জীবনের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেন।

এই সভায় অশোক ঘোষের একটি সুপারিশ: খেলার মাঠে উত্তেজনা প্রশমনে এবং অশোভন আচরণ বন্ধে মোহনবাগান ক্লাব পথিকৃৎ হোক।সেটাই হবে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের স্মৃতির প্রতি সব থেকে বড় শ্রদ্ধা প্রদর্শন। ❀



কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় স্মরণে মোহনবাগান ক্লাবের শোকসভায় বক্তৃতা করছেন উমাপতি কুমার

ফুটবলে ধারাবিবরণী প্রসঙ্গে

ফুটবল খেলার ধারাবিবরণী বাংলায় দেওয়া হচ্ছে দেখে খুবই ভাল লাগছে। যারা ধারাভাষ্যকাররূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছেন তাঁরা কেউ অতীতের দিকপাল খেলোয়াড় নতুবা বর্তমানের মোটামুটি নামকরা সাংবাদিক। সুতরাং এদের কাছ থেকে ধারা-ভাষ্য শোনবার সময় আমরা অনেক কিছু আশা করছি। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে ব্যর্থ হচ্ছি সেটা বোধহয় ফুটবল প্রেমীদের না বললেও হবে। আমার বক্তব্য গত ২৩-৫-৭৯ তারিখের ধারাভাষ্য নিয়ে। সেদিন ধারাভাষ্যকার হিসেবে ছিলেন এককালের নামকরা খেলোয়াড় শ্রদ্ধেয় সুকুমার সমাজপতি এবং তার সহকারী হিসেবে ছিলেন রথীন মিত্র। কিন্তু আমার বক্তব্য সমাজপতি মহাশয় সম্পর্কে। যারা মন দিয়ে ওই তারিখের খেলা শুনেছেন তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন শ্রদ্ধেয় সমাজপতি মহাশয় দিলীপ পালিতের মতো খেলোয়াড়কে বেশ কয়েকবার ঝাঁকিয়ে বলে উঠেছেন কোন বুদ্ধিমান খেলোয়াড়ের-এটা করা উচিত হচ্ছে না। (যখন দিলীপদা বিদেশ বসুকে ভুল পাস দিচ্ছিলেন)। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে খেলা চলাকালীন তিনি খেলার বিবরণী ছেড়ে দিয়ে এত বেশী খেলোয়াড়দের সমালোচনা করেন যে ভীষণ বিরক্ত লাগে। আমরা খেলা চলাকালীন খেলাটাই শুনতে চাই, নিশ্চয়ই সমালোচনা নয়। সমাজপতি মহাশয় কথাটা পালিতদাকে অনেক মিষ্টি ভাষায় বলতে পারতেন। তিনি তো বেশ কয়েকবার সেদিন বলেছিলেন সুব্রত, প্রসুন, গৌতম, দিলীপ ভবিষ্যৎ ফুটবলারদের কাছে আদর্শ, তেমনি যারা খেলার ধারাবিবরণী দেন তারাও যে অনেক ভবিষ্যৎ ধারাভাষ্যদের নিকট আদর্শ। এটা বোধহয় ধারাভাষ্যকাররা জানেন না। তাই জিজ্ঞাস্য যেদিন পালিতদা খুবই সুন্দর খেলবেন সেদিন নিশ্চয়ই তিনি তার উচ্চ প্রশংসা করবেন বা করতে বাধ্য হবেন। সমাজপতি মহাশয়দের মতো মানুষ যদি মাইক্রোফোনের সামনে বসে মেজাজ হারান, তাহলে যারা দলের সমর্থক তাদের সঙ্গে পার্থক্যটা কোথায় থাকলো?

নিবেদিতা চক্রবর্তী, গোলাপট্টী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(২)

আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ আমাদের খেলার খবর প্রচার করেন কিন্তু সেটা নিতান্তই অল্প। কলকাতার সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লিগের খেলাগুলি বাংলায় প্রচার করার জন্য আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। কারণ অনেক উৎসাহী ক্রীড়া-মোদী ইংরাজি ধারাবিবরণী ভালভাবে বোঝে না। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি তারা যেন বাংলায় খেলাধূলার সংবাদ প্রচার করেন। এতে আমরা উপকৃত তো হবোই, বাংলার ছেলেমেয়েরা খেলায় উৎসাহ পাবে। এটা শুধু আমার একার বক্তব্য নয়, আমি কেবল অনেকের বক্তব্য আপনাদের জানাচ্ছি। খেলার আসর কর্তৃপক্ষকেও অনুরোধ করি, আপনারাও যেন আমাদের হয়ে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে ওই অনুরোধ করেন। প্রসূন মুখার্জি, বর্ধমান।

(৩)

বেতার কেন্দ্রকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না। গ্রামবাংলার অগণিত ক্রীড়ামোদী যারা চিরকালই খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত, তারা অন্ততঃ রোজ বাংলা ধারাবিবরণী শুনে খানিকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছেন।

কিন্তু ইদানীং যারা ধারাভাষ্য দিতে আসছেন তাদের অধিকাংশেরই কণ্ঠস্বর বিকৃত এবং উচ্চারণ খুবই অস্পষ্ট। যেমন এবছর লিগে ইস্টবেঙ্গল ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের মধ্যে খেলার দিন যে দু'জন ভাষ্যকার এসে-ছিলেন তাদের মধ্যে একজন প্রতিবারই 'সুরজিৎ' কে 'সুরগীত', 'সত্যজিৎ' কে 'সত্য-গীত' এবং 'কারণ' এই সামান্য কথাটি উচ্চারণ করতে গিয়ে বারবার 'তারণ' বলে ফেল-ছিলেন। আমাদের প্রশ্ন এই ধরনের ভাষ্যকারেরা প্রবেশাধিকার পান কি করে।

সবশেষে সকল ধারাভাষ্যকারের নিকট আমাদের একটা ছোট্ট অনুরোধ আপনারা 'লাইন-আপ' বলবার সময় 'রিজার্ভ' প্লেয়ার-দের নামগুলোও দয়া করে জানাবেন এবং রেফারির সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লাইন্সম্যান এবং অতিরিক্ত রেফারির নামটাও জানাবেন।

সভাবৃন্দ 'রূপম রেজিমেন্ট' দত্তপুকুর ২৪ পরগনা।

পাঠকের কলমে

(৪)

৮ জুন খেলার আসর সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে লিখিত আকাশবাণীর বাংলা ধারাবিবরণী প্রচারের বিরোধিতা করে যে লেখা প্রকাশিত হয়েছে তা মোটেই আশা-ব্যাঞ্জক নয়। কেননা, আপনার উক্ত,— 'যতদিন ভাল ভাষ্যকার না পাচ্ছেন, ধারাভাষ্য বন্ধ রেখে শ্রোতাদের বিরক্তির হাত থেকে রেহাই দিন।' এই কথাটাই যদি বাস্তবে রূপায়িত করতে হয় তবে বিনা পরীক্ষায় কি ভাল ভাষ্যকার খুঁজে পাওয়া যাবে? আমি বলব, আকাশবাণীর এই পদক্ষেপ কেবলমাত্র ভাল ভাষ্যকার খুঁজে বার করার জনাই। নিশ্চয়ই তার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষার-নিরীক্ষার দরকার। সুতরাং বর্তমান ধারাভাষ্য প্রচার এক নতুন আবিষ্কার। আপনি আবার বলেছেন, পুষ্পেন সরকার ও অজয় বসুর মত ভাষ্যকারের কথা। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন, প্রত্যেকদিন একই লোকের ধারাভাষ্য শুনতে মোটেই ভাল লাগে না। সুতরাং তার জন্য চাই পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের ফলেই পাওয়া যাবে আগামী দিনের ভাবী পুষ্পেন, অজয় প্রমুখ। আর যেহেতু চট করে এদের পাওয়া যাচ্ছে না সেইজন্য ধারাভাষ্য বন্ধ করে দিতে হবে? দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানও কি অন্যায়? বহু ক্রীড়ানুরাগী আছেন যাদের পক্ষে ওই ধারাভাষ্য একমাত্র সম্বল, তাদের কি আপনি দূরে সরিয়ে রাখতে চান? মনে হয়, নিশ্চয়ই না। তাই আমাদের অর্থাৎ শ্রোতাদের অনুরোধ ধারাভাষ্য বন্ধ করবেন না, বরং এই সঙ্গে আকাশবাণীর কাছে আমাদের একটি আব্দার আপনারা প্রত্যেকদিন অন্তত একজন বিখ্যাত ভাষ্যকার রাখুন এবং অপর যে কোন একজনকে সহকারী হিসাবে রাখুন। আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে কয়েকজন বিখ্যাত ভাষ্যকারের নাম উল্লেখ করছি, অজয় বসু, পুষ্পেন সরকার, সুকুমার সমাজপতি, পি কে ব্যানার্জি এবং কমল ভট্টাচার্য।

প্রদোষ মজুমদার, ৩০১/১ অশোকনগর,

(৫)

আই এফ এ-কে অনুরোধ অবিলম্বে তারা স্যার দুখীরাম ফুটবল কোচিং সেন্টার-এর মতন একটা বেরী সর্বাধীকারী কমেন্ট্রি কোচিং



সেন্টার খুলুন। আমার মনে হয় হরলিক্স সংস্থার মতন কোন টুথপেস্ট সংস্থা এগিয়ে আসবেন। আর আধুনিক জিবছোলা দিয়ে সাহায্য করবেন। তাতে অন্তত ফুটবল ধারাবিবরণীতে এলোপাথাড়ি ভাষার হাত থেকে মুক্তি পাব। যেমন ২৫.৫.৭৯ তারিখে সত্যজিৎ মিত্রকে সত্যজিৎ রায় বা মনোরঞ্জনকে 'মনু' 'মনো' সুরজিতকে 'সুর' বলা শুনে মনে হল, এইসব খেলোয়াড়রা ভাষ্যকারদের পাশের বাড়ি বা একই পাড়ায় থাকেন বলে এই সব নাম বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এবং বেতারে বলার সময় তা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। যাই হোক। আমার প্রস্তাবটা আই এফ এ কর্তৃপক্ষ একটু বিবেচনা করে দেখবেন। মনে হয়, অনেকেই এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হবেন।

জনৈক শ্রোতা, কলকাতা।

(৬)

যে কোন বড় দলের খেলার দিন যারা আমাদের মতো অগণিত ক্রীড়ামোদীদের ধারা-ভাষ্য শোনান, তারা কি বড় দলের গুণ গাইতেই যান, তাদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে এ সামান্য জ্ঞানটুকুও নেই? গত ২৪ মে ইস্টবেঙ্গল বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন-এর খেলায় যারা ধারা-বিবরণী শোনালেন আমাদের, তারা কি ইস্ট-বেঙ্গলের সদস্য বা সাপোর্টার (অন্ধ)? এছাড়া অজস্র ভুল তো রয়েছেই, ভুল করে স্বীকার করলেও হয়, অনেকে তাও করেন না, একজন ভুল করলে আরেকজন সংশোধন করে দেন তাই দেখেছি। কিন্তু গত ২৪ মে মহামেডান বনাম কুমারটুলি দলের খেলায় দ্বিতীয় দলটির পক্ষের একমাত্র গোলদাতার নাম বলতে গিয়ে উভয় ভাষ্যকার শক্তি মিত্রের নাম করলেন অথচ দুটো বাংলা দৈনিকেই দেখলাম দেবাশীষ-এর নাম, এটা কি?

অমিতাভ সাহা, লালগোলা।



(৭)

গত ২৫ মে ইস্টবেঙ্গল বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের খেলার ধারাবিবরণী শুনে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বিশেষ করে গৌরীশঙ্করবাবুর ধারাভাষ্য শুনে, তিনি একাধিকবার সত্যজিৎ মিত্রের নাম বলতে গিয়ে 'সত্যগীত রায়' বলেছেন, তার উপর গুরদেব সিংকে বলেছেন, 'গুরদিব', এটি যেমন হাস্যকর তেমনি অবাক হবার ব্যাপার। কলকাতার লাখ লাখ মানুষ এই খেলার ধারাভাষ্য শুনেছেন। এইরকম মারাত্মক ভুল, তাছাড়া বলার কোন ধরনও তার ছিল না। বিপ্লববাবু একসময় তো বলেই বসলেন, 'রাজস্থান দল আক্রমণ করছে।' আমরা আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের সাহায্যে সব রিলেই শুনে আসছি। কিন্তু এ ধরনের নিম্ন মানের রিলে বোধহয় আমরা শুনিনি। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ এ ধরনের ধারাভাষ্যকারদের রিলে করতে দিয়ে বাংলা ধারাবিবরণীর মান ক্ষুণ্ণ করবেন না।

শ্রীকুমার, কৌস্তুভ, কল্যাণ চ্যাটার্জি, কালীঘাট, কলকাতা-২৬।

(৮)

আমরা এ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহামেডানের খেলার সব ধারাভাষ্যই শুনেছি। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল বনাম টালিগঞ্জ অগ্রগামীর খেলার ধারাবিবরণী শুনতে পাই নাই রেডিও স্টেশনের কিছু গোলযোগ হওয়াতে। যে ধারাভাষ্যগুলি শুনেছি, প্রত্যেকটি ধারাভাষ্যই ভাল হয়েছে। কিন্তু এই ভাল হওয়ার মধ্যেই কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। সেই ত্রুটির দুই একটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

যিনি ভাষ্যকার তিনি যদি সেই দলকে সমর্থন করেন তাহলে দেখা যায় যে সেই দল যদি গোল করে তাহলে তিনি আনন্দে আত্ম-হারা হয়ে কি বলবেন ভেবে পান না। এরকমই আরেকটি ঘটনা হচ্ছে যে কোন দর্শক যদি মাঠের ভিতর ঢুকে তার প্রিয় খেলো-য়াড়কে আদর করে তখন ভাষ্যকাররা বলেন আপনারা দেখতে পেলেন একটি ছেলে মাঠে ঢুকে তার প্রিয় খেলোয়াড়কে আদর করলেন, কিন্তু যারা শ্রোতা তারা কি করে দেখবেন? ইস্টবেঙ্গল বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলায় একজন ভাষ্যকার তার মুখে যা আসছিল তাই তিনি বলছিলেন। এই ছোট ভুলগুলোর জন্য ভাষ্যকাররা শ্রোতাদের সমালোচনার পাত্র হয়ে ওঠেন।

টিঙ্কু, বুলা, অসীম, মিণ্টু, অমল, মিলন, ভজা, কল্যাণ, চন্দন, শেখর, রবীন, আগড়পাড়া ইলিয়াস রোড, কলকাতা-৫৮।

বড় বলেই কি এতো ক্ষমা

৬ জুন, কলকাতার সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লিগের ইস্টবেঙ্গল বনাম টালিগঞ্জ অগ্রগামীর খেলা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই খেলাতে সবচেয়ে বেশী যে ঘটনাটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা হল রেফারি রবি চক্রবর্তীর ফিফার আইন (ফুটবল) ব্যতিরেকে নিজস্ব আইন অনুযায়ী খেলা পরিচালনা করা।

ফিফার ১২ নং আইনের ৫ (ট) ধারা অনুযায়ী যদি কোন খেলোয়াড় বারংবার খেলার নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তবে সেই খেলোয়াড়টিকে সতর্ক করতে হবে এবং বিপক্ষ দল অপরাধের স্থান থেকে ফ্রি-কিক পাবে। কিন্তু ওই

খেলাতে ইস্টবেঙ্গল দলের সুরজিত সেনগুপ্ত ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের বারংবার বিসদৃশভাবে লাথি মারবার পরেও দেখলাম যে রেফারি তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তি দিলেন না। অবশ্যই সেই ঘটনাগুলিতে অ্যাডভ্যান্টেজ রুলের কোন পরিস্থিতি ছিল না। তাই, রবিবাবুর কাছে জিজ্ঞাসা যে, তিনি কোন আইনে এই খেলায় সুরজিতসেনগুপ্তকে বারবার ক্ষমা করেছেন। বড় ক্লাবের খেলোয়াড় বলেই কি তাকে ক্ষমা করা হল ?

তপন মুখার্জি, জগাছা, হাওড়া।

অন্ধ ভালোবাসা

কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে বাংলার ফুটবল প্রেমিকদের মাতামাতি অনেকটা পাগলামীর মত দেখায়। যে খেলোয়াড়দের দ্বারা বাংলার পূর্ব ঐতিহ্য কেবলমাত্র ম্লানই হয়নি, কলঙ্কিতও হয়েছে; (বিভিন্ন মাঠে খেলোয়াড়দের ব্যবহারে) উদ্ভট ভালবাসার আবেগ সামলাতে তাদেরই পায়ে মাথা ঠুকছে বাংলার সহস্র মানুষ। ফুটবল-প্রেমীগণ যদি মনে করেন এটা প্লেয়ারদের প্রতি আমাদের প্রেরণা, তাহলে আমি বলবো এটা দুর্যোধনের প্রতি শকুনি মামার প্রেরণা। আজকে বাংলার কোন ফুটবল খেলোয়াড়েরই মনে নেই যে তাদের বিশ্বমানে পৌঁছাতে এখনো অনেক দেরী। তারা জেনে নিয়েছে তারা বাংলার গৌরব। এর থেকে বেশী তাদের কিছুই করার নেই বা থাকতে পারে না। বিশ্বে কিছু করে ভারতের গৌরব হওয়ার অভিলাষ যদি তাদের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে ফুটবল-প্রেমীদের অন্ধ ভালোবাসার মাত্রাই তার প্রধান কারণ।

বাংলার ফুটবল-প্রেমীগণের জেনে রাখা উচিত, বম্বের ক্রিকেট-প্রেমীদের বা পাঞ্জাবের হকি-প্রেমীদের অবশ্যই মাতামাতি করবার কারণ আছে (যদিও তারা অতটা করে না যতটা বাংলার ফুটবল-প্রেমীগণ করেন)। কিন্তু বাংলার ফুটবল-প্রেমীদের নাচানাচি, বনদেশের শেয়াল রাজাকে সম্বর্ধনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রবীর কুমার মিত্র, হরজিন্দার নগর, কানপুর।

কল্পনা যা পারেনি

১ জুন প্রকাশিত 'কল্পনা—পুলিস অ্যাথলিটদের সেরা'—নিবন্ধটির জন্য ধন্যবাদ। উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা, ঠিকমত কোচিং-এর অভাবে কত যে প্রতিভা, বিশেষ করে গ্রাম্য প্রতিভা অবহেলায় উপেক্ষায় নষ্ট হয়ে যায় তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই কল্পনা মুখার্জি। আজকের যে কল্পনা, সে তো প্রায় ফুরিয়ে যাওয়া কল্পনা। যে সু-স্বাস্থ্যের এবং ক্রীড়া দক্ষতার সে অধিকারিণী ছিল, আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় ঠিক সময়ে সবকিছু পেলে সে কমলজিৎ সান্ধু, এঞ্জেল মেরি হতে না পারলেও নিদেন পক্ষে অনিমা, শ্রীরূপাদের সমকক্ষ হতে পারতোই। তবুও সে যে প্রায় নিজের চেষ্টায় এতদূর এগোতে পেরেছে এবং আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকে বিলম্বে হলেও স্থান করে নিতে পেরেছে তার জন্য আমরা তার গ্রামের ক্লাবের ছেলেরা গর্বিত ও আনন্দিত। পরিশেষে জানাই কল্পনা যা হতে পারেনি, তা হয় তো তার গ্রামের ক্লাবের ছেলেমেয়েরা (যার মধ্যে তার ভাই বোনেরাও আছে), তা হতে পারে যদি কোনও ভাবে খেলাধূলার সম্বন্ধে কোনও ক্রীড়ানুরাগী বা ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা কিছুমাত্রও সাহায্য পায়।

তারক দত্ত ও শম্ভু দাস, পারশ্যামপুর, হুগলী।

খেলোয়াড়দের নামে কুৎসা রটানো বন্ধ হোক

গত ১ জুন খেলার আসরে প্রকাশিত 'আমাদের দোষ নেই' চিঠিতে আমার কিছু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বোনেরা নীলিমা দেবীর 'পূজা যে সে নিরাসক্ত থাকে ; যে পূজক সে অনেক কিছু দোহি দোহি করতে করতে পূজো করে'—উক্তিটির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেছে ফুটবলারদের ক্ষেত্রে অন্তত উক্তিটি প্রযোজ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ তারা দুজন খেলোয়াড়কে 'খেলার আসরে' তুলে ধরেছে। আমি তাদের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে ফুটবল প্রেমী কিশোরীদের তরফ থেকে কিছু বক্তব্য রাখছি!

(১) ছোটবেলা থেকেই একটা কথা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং গুরুজনদের মুখে শুনে আসছি যে খেলাধূলা করলে চারিত্রিক গঠন ও শারীরিক পটুতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিকাশও ঘটে। বিশেষ করে কোন সত্যিকারের খেলোয়াড়ের মধ্যে এই তিনটি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ এদের আদর্শকে সামনে রেখে বড় হয় আগামী দিনের খেলোয়াড়রা। সুতরাং এই সকল আদর্শবান খেলোয়াড়রা যে তাদের ফ্যানদের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে, এটাই বাস্তব সত্য বলে ফুটবল-প্রেমী কিশোরীদের নিকট বিবেচিত।

(২) তবুও আমাদের সকলের মনে রাখা উচিত খেলোয়াড়রাও মানুষ। ফলে তাদের মধ্যেও চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই বলে তাদের ব্যক্তিগত ত্রুটিগুলোকে সবার সামনে তুলে ধরে তাদের ইমেজকে ধুলিস্যাৎ করবার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই, আছে ফুটবল-প্রেমী হিসাবে লজ্জা। কারণ খেলোয়াড়দের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ হয় মূলত তাদের খেলার উপর এবং এই খেলার বিচারেই আমরা তাদের শ্রদ্ধার সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে পুজো করি, চারিত্রিক বিচারে কখনই নয়। সুতরাং একজন ফুটবল-প্রেমী হিসাবে তাদের এই কথাটাই ভাবা উচিত ছিল।

(৩) মন্তব্যকারিণী বোনদের কাছে আমার প্রশ্ন তারা কোন যুক্তিতে দু'জন ফুটবল খেলোয়াড়কে দিয়ে সমগ্র ফুটবল খেলোয়াড়দের বিচার করল ? নাকি ওরা দু'জন ফুটবলারকে দেখেই আন্দাজ করে নিয়েছে যে সকল ফুটবলারই 'একই পথের যাত্রী' ? তাই যদি হয় তবে আমি নিজে 'ভাস্কর গাঙ্গুলীর' ফ্যান। আমার মতো অন্যান্য ফুটবল প্রেমী কিশোরী বন্ধুরাও একেক জন একেক খেলোয়াড়ের ফ্যান। সুতরাং এই মুহূর্তে আমাদের অর্থাৎ অগণিত ফুটবল-প্রেমী কিশোরীদের জানতে ইচ্ছা করছে ভারত তথা পৃথিবীর আর কোন কোন ফুটবলারদের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে কুৎসা রটানোর মতো পুঁজি তাদের আছে ? নাকি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আক্রোশ হেতু আজ হাজার হাজার ফুটবল-প্রেমী কিশোরীদের মনে তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

রাজশ্রী চক্রবর্তী, কোক-ওভেন-কলোনী, দুর্গাপুর-২

স্পেনের কি হল

জন্ম লগ্ন থেকেই 'খেলার আসর' আমাদের মনোরঞ্জন করে আসছে। একজন একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে আমার আবেদন, ১৬৭০ জন ফুটবল খেলোয়াড় ধর্মঘট করার ফলে স্পেনে ফুটবলারদের কি ফল হল (২য় বর্ষের ৪৬নং সংখ্যার ১১ পাতায় তৃতীয় কলমে) বলতে পারেন ?

সুধীর চন্দ্র দাস, বিক্রমগড়, কলকাতা-৩২

তথ্য ঠিক ছিল

৮ জুনের (১১৭৯) খেলার আসরে 'তথ্য ঠিক নয়' শিরোনামে প্রদীপ কুমার সাধকের একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। ওই চিঠিতে ১১ মে সংখ্যায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে তথ্যের ভুল ছিল বলে বলা হয়েছে। আসলে আমার দেওয়া তথ্য ওলিম্পিক অর্গানাইজিং কমিটি প্রকাশিত তথ্য নির্ভর করে লেখা। ওই তথ্য অনুসারে হাঙ্গেরীর ৯ম স্থান ও রুমানিয়ার ৬ষ্ঠ স্থান আছে। কানাডার পদক সংখ্যা অবশ্য রৌপ্য ৫ এবং ব্রোঞ্জ ৬টি।

অতীন সরকার, কলকাতা-৮৬।

রীতার জন্য গর্ব হয়

টোকিওতে অনুষ্ঠিত 'এশীয় ট্র্যাক এ্যাণ্ড ফিল্ড' প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের বাঙালী মহিলা প্রতিযোগিনী রীতা সেন এক নজীর গড়েছেন। তিনি সেখানে ৪০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় হয়ে রৌপ্য পদক জয় করেছেন এবং সেই সঙ্গে তিনিই একমাত্র ভারতীয় মহিলা, যিনি ৪০০ মিটার দৌড়ের ফাইনালে ওই সাফল্য অর্জন করেছেন। রীতা সেনের এই সাফল্যে আমরা স্বভাবতই বিশেষভাবে গর্বিত। রীতা সেনের আরো সাফল্য কামনা করি।

তাপস কুমার সাহা, দুর্গাপুর-৪, বর্ধমান।

'অবহেলিত ফুটবলার সুধীর কর্মকার'

২৫ মে 'ফুটবলার সুধীর কর্মকারে'র জীবন বেদ পড়লাম। দারিদ্রের নিষ্ঠুর উপহাসে ও জীবনের বন্ধু আক্রমণকে ট্যাকল করে কিভাবে আজ বিরাট ফুটবলার হয়েছেন তা আদর্শ-স্বরূপ। ফুটবলার হিসাবে শুধু বিরাট নন, অন্তরটাও বিরাট। কিন্তু তার মত মহান ফুটবলারও তার যোগ্যতার পুরস্কার হিসাবে যে অবিচার, অবহেলা, অপমান পেয়েছেন তা মর্মান্তিক! তার বিরাট যোগ্যতার কাছে নিষ্প্রভ সেই 'অর্জুন' পুরস্কারও পাননি আর জাতীয় দলের নেতৃত্ব দিতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু ভারতের বিচারক কমিটি দেখান আজকের ভারতে এমন কোন খেলোয়াড় চরিত্র আছে যা বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ফুটবলার সুধীর কর্মকারের চরিত্রকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে বা



তার চেয়েও 'অর্জুন' পাওয়ার বেশী যোগ্যতা আছে ? আপনাদের বহুল প্রচারিত পত্রিকাতে সুধীর কর্মকারের চরিত্র তুলে ধরছি।]

১। সকলেই স্বীকার করবেন জার্নেল সিং-এর পর সুধীর ভারতের শ্রেষ্ঠতম দুর্ধর্ষ ডিফেণ্ডার এবং এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্যতম। কতকগুলি বড় প্রতিযোগিতায় যেসব অবধারিত গোল বাঁচিয়েছেন তা কল্পনাতেই সম্ভব।

২। সুধীরকে খেলার মাঠে কোনদিন অঙ্গভঙ্গী করতে দেখা যায়নি বা রেফারিকে হলুদ কার্ড দেখাতে হয়নি, এমন ঘটনা বিরল, একথা নিশ্চয়ই সবাই স্বীকার করবেন। এত বড় ডিসিপ্লিনের মানসিকতা এত বড় স্পোর্টসম্যানশিপ দেখা যায়নি বললেই চলে বর্তমান কালে।

৩। [২৫ মে-র খেলার আসরে লেখানুসারে] গত ১৯৭৪ তেহরান এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে পায়ে চোটের জন্য যাননি। গেলে হয়তো অধিনায়কও হতেন ও অর্জুন'ও পেতেন। কিন্তু ভাল খেলতে পারবেন না বলে খেলাকেই আসলে বড় মনে করে যাননি। সরল মনের এত বড় নির্ভেজাল ক্রীড়াদরদী বর্তমানে দুর্লভ।

৪। সুধীর বর্তমানে ব্যতিক্রম চরিত্র, তিনি গ্ল্যামার প্রেমী নন। তিনিই সম্ভবত একা যিনি রেডিওতে ইণ্টারভিউ দেন না। টিভিতে হাজির হন না, সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলেন। বিরাট ফুটবলার হয়েও নিজেকে জাহির না করার, খেলার মধ্যেই আত্মসমাহিত থাকার এরকম মহান আদর্শ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

এরকম আরও অনেক তার খেলোয়াড়ী চরিত্র বৈশিষ্ট্য আছে। এত বড় চরিত্রের খেলোয়াড়ী প্রতিভাকে আমরা অবহেলা করেছি। তার যোগ্য মর্যাদা দিচ্ছি না।

অজয় কুমার চক্রবর্তী, শ্যামবাজার, হুগলী।

এবারের সেরা চিঠির জন্ত পুরস্কার পাবেন অজয় কুমার চক্রবর্তী, শ্যামবাজার, হুগলী।

নিয়ম কানুন

এখন থেকে 'খেলার আসর'-এর এক বছরের গ্রাহক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৫ টাকা। ছয় মাসের জন্য ৩৫ টাকা। রেজেস্ট্রি ডাকে পেতে হলে অতিরিক্ত যথাক্রমে ৪০ টাকা ও ২০ টাকা দিতে হবে। গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্যে অতিরিক্ত মূল্যে দিতে হবে না। গ্রাহকচাঁদা মনিঅর্ডার বা ব্যাঙ্ক-ড্রাফট করে পাঠাতে পারেন। পাঠাবেন আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান **Eastern Horizon,** ৭ ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৩ ঠিকানায়।

যারা ইতিপূর্বে গ্রাহক হয়েছেন চাঁদার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা গ্রাহক তালিকাভুক্ত থাকবেন, অতিরিক্ত চাঁদা না দিয়েই। মেয়াদ শেষে তাদেরও নতুন হারে চাঁদা দিতে হবে। মনে রাখবেন চাঁদার নতুন হার চালু হয়েছে ৬ এপ্রিল '৭৯ সংখ্যা থেকে।

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৪৭, বিপ্লবী অনুকূল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২
ফোন : ২৭৩৩১৬ ও ২১-২১৬৬।



এ উন্মাদনার পরিণতি কী ?

সুভাষ দত্ত ঃ লিগ শুরু হওয়ার পাক্কা দু' সপ্তাহ পর ঘরোয়া ফুটবলের তিন প্রধান এবার খেলতে নামে। প্রথম দিনটি থেকেই এবারের দর্শককুলের অস্থিরতা নজর কেড়েছে। আসরে প্রথম নামে মহমেডান এবং সে-দল প্রথম ম্যাচেই ক্যালকাটা জিমখানার কাছে পয়েন্ট খোয়ানোয় তার সমর্থকদের উৎসাহ কিছুটা স্তিমিত। এক এক করে অন্য দুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল খেলেছে এবং যেন তেন প্রকারে জিতেছে। ফলে মহমেডান সমর্থকদের উদ্দীপনায় জোয়ার আসতে ব্যর্থ হয়েছে।

উন্মাদনায় ঘাটতি, এখন যা অবস্থা তাতে সকলের পক্ষেই ভালো। সেক্ষেত্রে মহমেডান স্পোর্টিং-এর সমর্থকদের উন্মাদনায় ঘাটতি নিশ্চিতভাবেই মন্দের ভাল!

কিন্তু ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান? এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রতিটি খেলার পর এই দুই দলের সমর্থকদের মনের স্থানটা দখল করছে হতাশা আর আত্মপ্রবঞ্চনা। সৃষ্ট হচ্ছে ক্রোধ।

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলার মাঠে 'চির প্রতিদ্বন্দ্বী' হলেও এদের সমর্থকরা? হয়ত লিগে দু' দলের সাক্ষাৎকারের পর শব্দটা বদলে 'চির শত্রু' হিসেবেই বোধহয় লিখতে হবে। দীর্ঘ ১১ বছর ময়দানে একজন নিয়মিত দর্শক হয়ে এবং সাংবাদিক হিসেবে কাজ করে চলেছি। ১৯৭৮ আর ৭৯—এই একটি বছরে দর্শকদের চরিত্র যেমন দ্রুত বদল হয়েছে, আর কখনো এমনটি দেখিনি।

১৯৭৮ পর্যন্ত কখনো দেখেছেন কি, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের প্রত্যেক ম্যাচের দিন দুপুর এগারোটার পর সুবার্বান ট্রেনের কামরাগুলি লাল-হলুদ অথবা সবুজ-মেরুণ পতাকায় ছাওয়া? গাড়িতে উঠে প্রতিদিন ভেঁপু আর উলুধ্বনিতে আপনার কানের পর্দা ফাটার উপক্রম? অথবা 'ছারপোকাদের দেখে নেব', 'জার্মানদের দেখিয়ে দেব' হুঙ্কারের সঙ্গে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের বর্ষণে আপনার গায়ের জ্বর কি একশো পাঁচ ডিগ্রিতে পৌঁছয় না?

ট্রেন-বাস-ট্রাম সর্বত্রই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। একান্ত নবিশ-মেঠুরে আর সামান্য বিবেকবানরা ছাড়া এই ভেঁপুওয়ালাদের কেউই টিকিট কাটে না। গেট আটকে রাখে ভেতরে ফাঁকা থাকলেও 'দলে'র লোক ছাড়া অন্য সবার প্রবেশাধিকার ওরা হরণ করে। একদিন ষাটোর্ধ এক বুড়ির ট্রেন থেকে নামতে ভিড়ে এক পা আটকে গেল, ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

এই অত্যুৎসাহীদের জন্য নতুন নতুন ব্যবসার কথা শোনা যাচ্ছে। যেমন নাকি, ঠোঙা করে বাদামের মত ইঁট বিক্রি। লাল-হলুদ অথবা সবুজ-মেরুণ জামা গেঞ্জি মায় কব্জির ব্যাণ্ড বিক্রি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এদের জ্বালায় ফুটবলারদের জীবনও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মাঠে ঢুকে পায়ে হামড়ে পড়া, ক্লান্ত শরীরটাকে (জেতা ম্যাচের পর অবশ্যই) খোলামকুচির মত কাঁধে নিয়ে হৈ হৈ করা অথবা ছোট দলকে ইঁট মেরে হারতে বাধ্য করা অনেক কিছুই উল্লেখ করা যায়—যার সব কিছুই এই উদগ্র ফুটবলপ্রেমীদের বিরুদ্ধেই যায়।

এই উন্মাদ দর্শকদের (যাদের বেশির ভাগ ১৪ থেকে ২৪ বছরের) গালাগালি আমার মত অনেকেই করতে পারে। মাস্টারী করে উপদেশ দিতে পারে (যদিও একেবারে শিশু-দর্শকও সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে, 'জ্ঞান দেবেন না মোসাই।'), কিন্তু এই উন্মাদনার আসল কারণটার শিকড় বের করে তাকে ধ্বংস করে সাচ্চা ফুটবল-প্রেমী দর্শক তৈরি করার কোন সু-প্রচেষ্টা কেউ করে কি বা করবে কি?

মানুষ যখন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়, তখন তারা একটা কুটো ধরেও ভেসে থাকার জন্য আকুল হয়। এই কিশোর তরুণ-যুবা অত্যুৎসাহীরা সেরকমই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানকে ধরে মনের খোরাক পেতে চেয়েছিল। ১৯৭০ থেকে ৭৫—ছ'বছর ইস্ট-বেঙ্গলের লিগ জয়ের পর ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা উত্তেজনার এভারেস্টে পৌঁছে ভাবতে শুরু করেছিল, এদল কখনও হারতে পারে না। অপরদিকে মোহনবাগান লাখ লাখ টাকা ব্যয় করেও যখন ৫—০ গোলে হারার রেকর্ড করল তখন মোহনবাগান সমর্থকরা ঘরের বউকে ধরেই মার শুরু করল। আমার নিজের চোখে দেখা, প্রখ্যাত খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তা শৈলেন মান্নাকে কেমন থুথু দিয়ে ওরা 'অভিনন্দিত' করেছে। হতাশার চূড়ান্ত অবস্থানে পৌঁছে ওরা আবার আশার আলো দেখে ৭৬-এ ১৫ সেকেণ্ডে আকবরের দেওয়া গোলে।

ইতিমধ্যে বিরাট বিরাট খেলোয়াড় এলো ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ম্যাচের সংবাদ পরিবেশন করতে, রেডিও-টিভিতে ধারাভাষ্য অথবা বিশেষজ্ঞের অভিমত দিতে। আগুনে ঘৃতাহুতি! ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের সাক্ষাৎকার হয়ে দাঁড়ালো বাংলার মানুষের প্রধান পার্বণ।

তা সত্ত্বেও এবার পাগলামোটা যেন অনেক বেশি। তাই এবছর প্রতিনিয়ত একটা-ভয় হৃদপিণ্ডটা কুরে খাচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবার শত্রুতার চরম প্রকাশ ঘটাবে না তো? দশ-বারো লাখ টাকা ব্যয় করে বাংলার বাইরে থেকে খেলোয়াড় কিনে এনে ক্লাব-কর্মকর্তারা বছরের শুরুতে এই কিশোর-তরুণ-যুবাদের মনে যে ভয়ানক স্বপ্নালু আবেশ সৃষ্টি করেছিল, সেই আবেশ প্রথম দিকেই কেটে গেছে, এখন তা আক্রোশে পরিণত হতে চলেছে।

অথচ এই উন্মাদনাময় প্রাণগুলির অনেকেই ভীষণ বুদ্ধিমান। এইতো সেদিন চৌঠা জুন। মোহনবাগান-বি এন আর ম্যাচ দেখে ময়দানে ৪২-এর শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাশ দিয়ে ফিরছি। হঠাৎ একটি মন্তব্য আমাকে থমকে দিল। কানে ভেসে এল, একজন তার বন্ধুকে বলছে, 'দেখ, দেখ! এই সেই বোকা মহিলা। হায় মা কেন যে পুলিসের গুলিতে প্রাণ দিলে!' চেয়ে দেখলাম ১৩/১৪ বছরের এক বুদ্ধিদীপ্ত কিশোর। ইস্টবেঙ্গল মাঠে আর এক তরুণকে বলতে শুনেছি, 'মিহির-ফিহিরের বেশি দাম বেড়েছিল। ওদের টাইট দিতেই ভুষো মাল সত্ত্বেও বাইরে থেকে এদের আনা হয়েছে।'

সুতরাং এখনও সময় আছে। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সাক্ষাৎকারের আগে উৎসাহটাকে উন্মাদনা হয়ে যাওয়া থেকে ঠেকান। অন্যথায় মাঠের শত্রুতা পাড়ায়-পাড়ায়, অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়বে। যার ফল হয়তো জামশেদপুরকে ম্লান করে দেবে। কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই তা চাইতে পারে না। তাই খেলা যাতে খেলার মাঠেই থাকে সেজন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার। তাতে প্রত্যেকের মঙ্গল, ফুটবলেরও মঙ্গল। ●

কুস্তিগীর চাঁদগীরামের বিয়ে ঃ ধুন্ধুমার কাণ্ড

চণ্ডিগড় থেকে মদন পাল ভার্মা

কুস্তিগীরের বিয়ে নিয়ে সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। হাজার হাজার টাকার ঘুষ (কন্যাপণ ?), মধ্য রাত্রে সশস্ত্র দুই সঙ্গীসহ বৌ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, সরকারী মহলে হৈ চৈ, চাকরি থেকে বরখাস্ত—সব মিলিয়ে একেবারে ঘটনার ঘনঘটা। এদিকে স্বনামখ্যাত বিয়ের পাত্রটি খবরের কাগজের লোকদের বলেছেন—ও সব কিছু মিথ্যে, ডাহা মিথ্যে।



চাঁদগীরাম

'মাস্টারজী' নামেই সকলে চেনে, পুরো নাম বলেন মাস্টার চাঁদগীরাম। গোলমালটা তাকে নিয়েই। কুস্তি জগতে মাস্টারজী খুবই বিখ্যাত ব্যক্তি। ১৯৬১-'৬৩ সালে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন, '৬২, '৬৮, '৭২ সালে হিন্দ কেশরী, '৬৯-এ রুস্তম-ই-হিন্দ, '৬৯-'৭০-এ ভারত ভীম, '৭০-এ অর্জুন পুরস্কার, '৭২-এ 'পদ্মশ্রী' আর 'মহাভারত কেশরী' খেতাব পান। এমন একজন নাম ডাকওয়ালা কুস্তিগীরকে যোগ্য সম্মান দেবার জন্য হরিয়ানা সরকার ক্রীড়া বিভাগের এ্যাডিশনাল ডিরেক্টরের পদ তৈরি করেছিলেন। নাবালিকা বিবাহের অভিযোগে সে চাকুরি গেছে, এবং রাজ্য সরকার ক্ষোভে দুঃখে এই নতুন তৈরি পদটাও বাতিল করে দিয়েছেন।

চাঁদগীরাম জন্মেছেন হিসার জেলায় ১৫ মার্চ ১৯৩৮ সালে। তার মানে এখন তার বয়স ৪১ বছর। দুটি বউ তার আগেই আছে, আর আছে দু বউয়ের পাঁচটি সন্তান। দ্বিতীয় স্ত্রী আসলে তার মৃত দাদার বিধবা, স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী এখন তিনি চাঁদগীরামের স্ত্রী। এরপরেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে চৌতালা গ্রামের এক নাবালিকাকে বিয়ে করার। উল্লেখযোগ্য চৌতালা গ্রামে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী দেবীলালের বাস্তুভিটে।

এই বিয়ের খবরটা একেবারে ঝড়ের মত সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সাংবাদিক দল চৌতালা গ্রামে গিয়েছিলেন খোঁজ খবর করতে, দেখা করেছেন চাঁদগীরামের সঙ্গেও। গ্রামবাসী আর চাঁদগীরাম—দু'পক্ষের বিবৃতিতে একেবারে আসমান জমিন ফারাক।

গ্রামবাসীদের বক্তব্য ঃ গত ১৪ মার্চ হরিয়ানার কুস্তিগীররা চৌতালা গ্রামে গিয়েছিলেন রাজ্য পর্যায়ের এক কুস্তি প্রতিযোগিতায়। সেখানে রাত কাটাবার সময় চৌতালা কুস্তি ফেডারেশনের সম্পাদক, প্রাক্তন কুস্তিগীর ওমপ্রকাশ, লোকজনের কাছে পরিচিতি ওমপ্রকাশ হিটলার-এর সঙ্গে চাঁদগীরামের বিয়ে নিয়ে আলোচনা হয়। মাস্টারজীর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য, এক দরিদ্র জাঠের মেয়েকে প্রথমে ঠিক করা হয়। কিন্তু দরিদ্র জাঠ ভদ্রলোক টাকার প্রলোভনেও রাজী হলনা, কারণ তার মেয়ের তুলনায় চাঁদগীরাম বয়সে অনেকটা বড়। তখন দুই নাপিত কুন্দনলাল আর বেগ রাই ওই গ্রামেরই এক সম্পন্ন চাষী রণজিৎ সিংএর দ্বারস্থ হয়, তার মেয়ে ঊর্মিলার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য। এই বিয়ের প্রস্তাব করা হয় ২০ মার্চ তারিখে। সে সময় চৌতালার গ্রামবাসীরা ব্যাপারটা জানতে পেরে, এই বেআইনী বিয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং তারা মুখ্যমন্ত্রী দেবীলাল ও তার ভাই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে।

মাস্টার চাঁদগীরাম ১' মে চৌতালায় এসে ঊর্মিলার বাবা রণজিৎ সিং এর খামারে আশ্রয় নেন। শোনা যায় সে সময় মাস্টারজী ঊর্মিলাকে একটা হাতঘড়ি আর তার বাবাকে বেশ কিছু টাকা দেন।

তারপর ১৯ মে রণজিৎ সিং-এর বাড়িতে 'রাতজাগা' নামে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়—অর্থাৎ সারা রাত ধরে ধর্মের গান হবে। ৮ জন মহিলা ধর্ম সঙ্গীত করছিলেন, শ্রোতা প্রতিবেশী পরিজন। হঠাৎ তারা লক্ষ্য করলেন গানের বিষয় বদলে গেছে, ধর্মের বদলে বিয়ের গান হচ্ছে। কথায় কথায় তখন তারা জানতে পারলেন ১৪ বছরের নাবালিকা ঊর্মিলার সঙ্গে ৪১ বছরের কুস্তিগীর চাঁদগীরামের বিয়ে হবে সে রাত্রেই। গ্রামের পুরোহিত পণ্ডিত ছোট্টুরামকে বিয়ে দেবার জন্য আনা হয়েছে, নগদ ৫০০ টাকা কবুল করে। জোগাড় যন্ত্র করে বিয়ে দিলেন এক ব্রাহ্মণ রমণী, এক নাপতানী, আরো ওই ধরনের কিছু লোকজন। পুরো ঘটনাটাই বিদ্যুৎ গতিতে একটি ঘণ্টার মধ্যে ঘটে গেল। শোনা যায় নাবালিকা কন্যাকে চাঁদগীরামের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য রণজিৎ সিং পেয়েছে নগদ বিশ হাজার টাকা। এছাড়াও গ্রামের স্বর্ণকার মণিরামের কাছ থেকে ১২ হাজার টাকার গহনা কেনা হয়েছে। গ্রামের যুবকরা টের পাওয়ার আগেই দুই সশস্ত্র সঙ্গীর পাহারায় গাড়ি চালিয়ে বৌ নিয়ে চাঁদগীরামের পলায়ন। চারদিন শ্বশুর বাড়ি থাকার পর ঊর্মিলা যখন গ্রামে ফিরলো, তখন আর তাকে চেনাই যায়না। ঊর্মিলা '৭১ সালে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হয়ে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিল। আর দশটা গ্রামের মেয়ের মত সে ছিল সাদাসিধে। কিন্তু চারদিন 'শ্বশুরালে' কাটিয়ে আসার পর তার পরিবর্তনটা তাকিয়ে দেখার মত—বব ছাঁট চুল, বেলবটম প্যাণ্ট, চোখে গগলস্। মাস্টারজীর কাছ থেকে যেসব উপহার পেয়েছে, সেগুলোই শুধু গ্রামবাসীদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়নি, একথাও জানিয়ে দেয় যে আসছে মাসে সে তার স্বামীর সঙ্গে বিলাইত' যাবে।

গ্রামবাসীরা এও জানিয়েছে, বিয়ের খবর জানতে পেরে চাঁদগীরামের এক ছেলে রণজিৎ সিং-এর সঙ্গে চৌতালা গ্রামে এসে দেখা করে। সে বলেছিল বিয়ে বন্ধ করা গেলে ১৫ হাজার টাকা দেবে। কিন্তু তার এ প্রস্তাবে কোন কাজ হয়নি, বরঞ্চ বেশ ভালোরকম প্রহার জুটেছে।

রণজিৎ সিং-এর ১০০ একর জমি আছে, দরিদ্র সে তো নয়ই, বরং বেশ অবস্থাপন্ন। তবু টাকার লোভ সামলাতে না পেরে নাবালিকা কন্যাকে বুড়ো বরের হাতে তুলে দিল—এ অনাচার গ্রামবাসীরা সহ্য করেনি। রণজিৎ সিং-এর এখন ধোপা-নাপিত বন্ধ, গ্রামের মধ্যে সে একঘরে।

সরকারী বক্তব্য ঃ সরকারী সূত্র থেকে জানানো হয়েছে, চাঁদগীরামের বিবাহের অভিযোগ সি আই ডি দপ্তর থেকে খতিয়ে দেখার পর, তার চাকরি নাকচ করা হয়, এবং তারজন্য ক্রীড়া দপ্তরে নতুন যে পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাও বাতিল করা হয়।

চাঁদগীরামের বক্তব্য ঃ 'আমি নাবালিকা কি সাবালিকা কাউকেই বিয়ে করিনি বা করার ইচ্ছে নেই, কারণ ইতিপূর্বেই আমি বিবাহিত। তিনি আরো জানান সংবাদপত্রে তার বিয়ের খবর যা প্রকাশিত হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তার সামাজিক ও কুস্তিগীর হিসাবে খ্যাতির প্রতি শত্রুতাবশত কোন এক স্বার্থান্বেষী মহলের রটনা।' পণ্ডিত ছোট্টুরাম, যিনি বিয়েতে পুরোহিতের কাজ করেছিলেন, তিনিও এখন বিয়ের ঘটনা অস্বীকার করছেন, তবে তার ভাই বলেছেন, বিয়ের রাতেই ছোট্টুরাম তাকে জানান বিয়ে দিয়ে তিনি পাঁচশো টাকা দক্ষিণা পেয়েছেন।

ভিন্ন মত ঃ হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে প্রতাপ সিং বলেছেন, এই বিয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ওমপ্রকাশ হিটলারের ইয়ার দোস্ত কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতায় এই ঘটনাটিকে ধামা চাপা দেবার চেষ্টা চলছে।

কেউ কেউ ভাবছেন 'মাস্টারজী'-কে মিথ্যে বিয়ের ঘটনা সাজিয়ে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তারা আর এক কুস্তিগীরের নাম করেছেন, শোনা যায় যার লক্ষ্য আছে চাঁদগীরামের পদটির প্রতি।

বিশ্ব-ক্রিকেটে 'ভারত' নামটি এখন সব থেকে নিচে

ম্যাঞ্চেস্টার থেকে সুব্রত সরকার

পত্রবোমার আতঙ্ক এই শিল্পনগরীর প্রধান পোস্ট অফিসকে অকেজো করে রেখেছে। ডাকবাক্সগুলিতেই চিঠিপত্র নির্দিষ্ট সময়ের অনেক বেশিদিন বন্দী থাকতে বাধ্য হচ্ছে। তাই প্রুডেনসিয়াল বিশ্বকাপ সম্পর্কে এ লেখা 'খেলার আসরে'র পাঠকের হাতে যখন পৌছবে তখন হয়তো চ্যাম্পিয়ন নির্ধারিত হয়ে গেছে।

তবে যখন এ লেখা পাঠানো হচ্ছে, তখন দ্বিতীয় বিশ্বকাপ বিজয়ীর সম্ভাব্য তালিকার প্রথম নাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। আর ছ'টি টেস্ট-খেলুড়ে দেশের মধ্যে সব থেকে নিচের নামটি, আমাদের দেশ—ভারত।

৯ জুন এই মাঠে প্রথম গ্রুপ লিগ ম্যাচে ৯ উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাতে ভারতের শোচনীয় হার বস্তুত কোন বিস্ময়ের ঘটনা নয়। নিউজিল্যাণ্ডের কাছে ৮ উইকেটের ব্যবধানে হার এবং শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার হাতে পর্যুদস্ত হওয়া ভারতের ক্রিকেট-সম্মান কোথায় নামিয়ে দিয়েছে তা বলা অপ্রয়োজনীয়।

এই প্রতিবেদনে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-ভারত ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটস-ম্যানদের কাছ থেকে অনেক বেশী নিষ্ঠা যে কেউ আশা করেছিল। কিন্তু তারা কী করেছে? গাভাসকরের কাছ থেকে আরও বেশী স্থিতধী ব্যাটিং প্রত্যাশিত ছিল। এ্যাণ্ডি রবার্টস চমৎকারভাবে একটি বল তার বাঁ কাধের পাশে উঁচু করিয়ে দিল, আর গাভাসকর বলটাকে চলে যেতে দেওয়ার বদলে হুক করল। ঠিকঠিক ব্যাটে-বলে হল না। ডিপ-ফাইন লেগ অঞ্চলে লোপ্পা ক্যাচ নিল মাইকেল হোল্ডিং।

ব্রিজেশও একই কারণে অর্থাৎ তাড়াহুড়ো করল। সে কভারে বল মেরে সহজ একটি রান নেবার পর দ্বিতীয় রান নেবার জন্য ছুটলো। বিশ্বনাথ বারণ করল বটে, কিন্তু ব্রিজেশ কি তা শোনে! সে একছুটে ব্যাটিং প্রান্তে। বিশ্বনাথও সেখানে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে। ভিভ রিচার্ডস-এর মতো ফিল্ডার শরীরের একটি ঝাঁকানিতে বলটি ধরে সোজা বোলারকে দিল। ব্রিজেশ রান আউট।

দেশের গভীর সংকটকালে গুণ্ডাপ্পা বিশ্ব-নাথের ৭৫ রান নিশ্চিন্তভাবেই এই ম্যাচের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় মনে করা যেতে পারে। যদিও দ্রুতগতি নিষ্কলুষ অপরাজিত সেঞ্চুরি (১০৬) গর্ডন গ্রিনিজকে 'ম্যাচ-শ্রেষ্ঠ'র সম্মান এনে দিয়েছে। প্রথমদিকে বিশ্বনাথের পরিমার্জিত ব্যাটিং দেখা না গেলেও তিরিশ পার হওয়ার পর সে তার নিজস্ব স্টাইল ফিরে পায়। তার সময় জ্ঞান ছিল অপূর্ব, আর মারে ছিল সমস্ত দর্শনীয় কাট, ড্রাইভ, পুলের বাহার। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্যাটিং-এর ব্যাকরণ ভুলে গিয়ে সে হোল্ডিং-এর একটি বলে বোল্ড হয়।

ম্যাচটিতে সকালের দিকে মেঘলা আকাশের জন্য কম আলো ছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েডের হাতে পেস বোলার যন্ত্রগুলি ছিল পর্যাপ্ত। বিকেলে আলো বেড়ে যাবে মনে রেখে (যা হয়েছেও) লয়েড টসে জিতেও ভারতকে ব্যাট করতে দেয়। বোলাররাও কার্পেটের গতি ও 'লিফ্‌ট' কাজে লাগায়।

ভর্তি দর্শকাসনে বেশ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ওয়েস্ট ইণ্ডিজরা ছিল। এদের মধ্যে একজন একটি কাঁসর নিয়ে এসেছিল। বোলাররা দৌড় শুরু করা মাত্র সে বেশ তালে তালে সেটি বাজাচ্ছিল। তবে ক্রিকেট ম্যাচের চেয়ে এই শিল্প-শহরের মানুষ কিন্তু মশগুল ছিল পত্র-বোমা নিয়ে আলোচনায়, উৎকণ্ঠায়।

ভারতের ইনিংস সম্পর্কে বলতে গেলে একথাই বলতে হয় যে তারা যেন সুন্দর চমকপ্রদ ক্যাচগুলো তুলে প্যাভিলিয়নে ফেরৎ যাওয়া দ্রুত করায়ই ব্যস্ত ছিল। গালিতে কালিস কিং ভীষণ নীচু হয়ে আসা ভীষণ কঠিন ক্যাচটি ধরে বুক ধুকপুক করা গাই-কোয়াডকে স্বস্তি দেয়। বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে উইকেটকিপার ডেরেক মারে যে ক্যাচটি ধরে মহীন্দর অমরনাথ সম্পর্কে আশা-ভরসার অবসান ঘটায়, তা স্মরণে রাখার মতো।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোলারদের মধ্যে মাইকেল হোল্ডিং অত কম 'রান-আপ' নিয়েও দ্রুততম এবং নির্ভুলতম নিশানায় বল করেছে।

যাইহোক, এরকম ভালো এবং ইতিবাচক পিচে ভারতের ব্যাটিং হতাশজনক। এবং যে-রান তারা করে, তা সংগ্রহ করা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে কোন কঠিন কাজ ছিল না।

বেদী তার ঝুঁটিতে ব্যাটিং-এর সময় নীল আর বোলিং-এ হাল্কা-সবুজ 'পটকা' ব্যবহার করে প্রথম তিন ওভারে প্রচুর রান দেয়। নতুন বলে কপিলদেব ও ঘাবড়ি যথেষ্ট চেষ্টা করেও তেমন ভালো বল করতে পারেনি।

অনভিজ্ঞ ভেসমণ্ড হেইনসকে সতর্কভাবে পরিচালিত করেছে এবং প্রতিটি বল সম্পর্কে অনবদ্য নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'বাবরি' চুলওলা ভারতীয় দলনায়ক ভেঙ্কটরাঘবন ছাড়া আর কোন ভারতীয় বোলার ওদের কাছ থেকে সমীহ আদায় করতে পারে নি। দুই ওপেনারের সর্ট রানগুলি নেয়ার ব্যাপারে সমঝোতা ছিল দারুণ। আর মাঝে মধ্যেই বাউণ্ডারি পার করায় ওদের কোন দ্বিধা দেখা যায় নি। দুজনেই ছক্কা মেরেছে একটি করে প্রথমে হেইনস কপিলের বলে এবং পরে গ্রিনিজ মহিন্দরের বলে।

কপিলদেবের একটি ফুলটসে লেগবিফোর হয়ে হেইনস বিদায় নেবার পর ভিভ রিচার্ডস আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাঠের হিরো গ্রিনিজ যদিও বেদীকে চমৎকার 'স্ট্রেট ড্রাইভ' করে রিচার্ডস তার হাতের জোর পরখ করেছে।

ভারতীয়রা অবশ্য ফিল্ডিংটা ভালোই করেছে। তবে প্যাকার ক্রিকেটের দশজন যে টিমে, তাকে রোখে এমন সাধ্য তাদের নেই। এই ম্যাচে গত শীতে ভারত সফর-কারী দলের একজন—অর্থাৎ আলভিন কালিচরণ ছিল



মহাসমরে রেফারির দায়িত্ব কতখানি

মিলন দত্ত ঃ খেলাতে—তৃতীয় দল—১১ জনের নয়—সবুজ-মেরুণ বা লাল-হলুদের দল নয়—সাদা কলারের কালো জামা পরা তিনজনের ছোট্ট দল—যার মধ্যমণি রেফারি। বিরাট দায়িত্ব—যার একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্তে মাঠে আগুন জ্বলতে পারে—পাড়ায় পাড়ায় আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে পারে। অনেকেরই কৌতূহল জাগতে পারে—এই লোকটি খেলার আগে কি করেন, কি ভাবেন—নিজেকে কিরকমভাবে প্রস্তুত করেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য—যার ওপর এই গুরু দায়িত্ব বর্তাবে তিনি কিন্তু নির্বাচিত হন খেলা শুরুর মাত্র আধ ঘন্টা আগে। অর্থাৎ মানসিক প্রস্তুতির জন্য তিনি মেরে কেটে সময় পান ৩০ মিনিট। এই সময়ের মধ্যেই তাকে পোশাক পরে নিতে হবে। সহযোগী লাইন্সম্যানদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে—কি উপায়ে নির্ভুলভাবে খেলা চালানো যায়, পরস্পরের সহযোগিতা সবচেয়ে বেশী কি করে পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে ইদানীংকালে বেশীবার যে রেফারি মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ খেলিয়েছেন—সেই নৃসিংহ চ্যাটার্জির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই তুলে ধরা যাক। ষাটের দশকে লিগে মোট ৬ বার আর শিল্ড-ফাইনালে মোট ৩ বার মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের দ্বৈত সমরের রেফারি ছিলেন এই নৃসিংহবাবু। শেষ খেলিয়েছেন ১৯৬৯ সালের শিল্ড ফাইনাল। তিনি স্বীকার করলেন, এই ১০ বছরে মাঠের পারিপার্শ্বিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। খেলোয়াড়দের অল্পেতেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। ফলে বর্তমানে অনেক রেফারিই এই খেলার পরিচালনভার নিতে দুবার চিন্তা করেন। তাছাড়া গত দশকে বেশ কয়বার ইডেনে খেলা হওয়ায় মাঠে নিরাপত্তা অনেক বেশী ছিল। ১৯৭৭ সালের কথাই বলি—লিগের এই খেলা শুরুর আগেই সবুজ গ্যালারিতে উভয় দল-সমর্থকের মধ্যে মার-দাঙ্গা এবং খেলা শুরুর আগে বেশ কয়েক হাজার দর্শক মাঠের চার পাশে বসে পড়েন। যার ফলে এই খেলা শেষ করতে সেদিনকার ভুক্তভোগী রেফারি দিলীপ সেন কি প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন—সেকথা ভাবতে দিলীপবাবুর এখনও শিহরণ জাগে। আর তিয়াত্তরের খেলার পর সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদারের ঘুঁষির ক্ষত রেফারি বিশ্বনাথ দত্তের চোখ থেকে এখনও মেলায়নি।

তবে নৃসিংহবাবুর সৌভাগ্য, এতবার মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলালেও তেমন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়নি। অবশ্য এরজন্য তার দক্ষতাকেই বেশী প্রশংসা করতে হয়। তার নিয়োগে কোন দলই আপত্তি করত না—উভয় দলের খেলোয়াড়দের মনে আস্থা ছিল—নৃসিংহবাবুর কাছে তারা ন্যায্য বিচারই পাবেন। তাঁকে একেবারে যে বিতর্কিত অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়নি, তা নয়। '৬৬ সালের লিগের খেলায় অ-খেলোয়াড়চিত মনোভাবের জন্য তিনি ইস্টবেঙ্গলের প্রশান্ত সিংহ আর মোহনবাগানের চন্দ্রেশ্বর প্রসাদকে মাঠ থেকে বার করে দিয়েছিলেন। এর জন্যে এক দলের ব্যারিস্টার-সভাপতি মাঠে ঢুকে তার দলের খেলোয়াড় বহিষ্কারের কারণ জানতে চেয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন। সেবার নৃসিংহবাবু অনেক কষ্টে এই লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোককে মাঠ ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন। শেষের কয়েক বছর লিগের প্রায় শুরু থেকেই এটা ধরে নেওয়া হত মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলানোর ভার নৃসিংহবাবুর ওপরই বর্তাবে। তাই আগে থেকেই শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে নিজেকে সেরকমভাবে প্রস্তুত রাখতেন। আর ততদিনে তেহরান-ব্যাংকক-কুয়ালালামপুরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি আরও পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ব্যক্তিত্বের জন্য কোন পক্ষই তার ওপর কোনরকম চাপ সৃষ্টি করেনি।

নৃসিংহবাবুর অভিযোগ—তাদের সময় খেলার আইনকানুন সম্বন্ধে দর্শকদের শিক্ষিত করবার কোনরকম চেষ্টা করা হত না। হাতে বল লাগলেই পেনাল্টির আবেদনে মাঠ তোলপাড় হয়ে যেত। অফসাইড নিয়ে প্রায়ই তুলকালাম কাণ্ড ঘটত। এখন অন্তত কিছু পত্রিকা এই ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। তাদের পাতায় নিয়মিত আইনের পর্যালোচনা থাকে। এক্ষুণি না পেলেও এর সুফল অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া যাবেই। আগে রেফারির ব্যর্থতাই খালি তুলে ধরা হত, ভাল খেলালে কোনরকম প্রশংসা পাওয়া যেত না। কিন্তু বর্তমানে, নৃসিংহবাবু আনন্দিত যে, এর যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে রেফারির প্রশংসাও করা হয়। ফলে রেফারির নিজের ওপর আস্থা বাড়ে—বেশী উৎসাহও পান। তবে নৃসিংহবাবুর মতে অবস্থার আরও পরিবর্তন প্রয়োজন। সাধারণত বিতর্কিত ঘটনা ঘটে গোলের সামনে—কিন্তু সাংবাদিকদের আসন অনেক দূরে। অতদূর থেকে ঘটনার যথার্থ পর্যালোচনা সম্ভব হয় না। আজকাল এই দু' দলের খ্যাতনামা খেলোয়াড়েরা অনেক সময় অকারণে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়—এর প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়ে উভয় দলের সমর্থকদের মধ্যে। অহেতুক চাপ পড়ে রেফারির ওপর। এই দুই দলের অতিরিক্ত খেলোয়াড়, কোচ এবং অত্যাবশ্যক কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনেক অতিরিক্ত লোক ফেন্সিং পেরিয়ে মাঠে ঢুকে পড়ে। তারা প্রতিনিয়ত নানারকম অশালীন মন্তব্যের সাহায্যে রেফারি লাইন্সম্যানের মনসংযোগের ব্যাঘাত ঘটায়। অথচ এর কোন প্রতিকার হয় না। এত কর্মকর্তা কেন মাঠের ভেতর বসবে? গত বছর আর্জেন্টিনায় বিশ্বকাপের খেলা টেলিভিশনে দেখানো হয়েছিল। কোচ, অতিরিক্ত খেলোয়াড় সকলেরই স্থান বিশেষভাবে নির্মিত ঘেরা জায়গার মধ্যে। এটা থেকে কিছু শিক্ষা পাওয়া যায়। টিম মাঠে নামলেই বা গোল হলেই 'গুরু-বন্দনার' জন্য দলে দলে বালখিল্যের দল মাঠে নেমে পড়ে অথচ যাদের ওপর এটা রোখবার ভার তারাও দর্শক বনে যায়।

নৃসিংহবাবু কলকাতার এখনকার রেফারিদের মান সম্বন্ধে বেশ উঁচু ধারণা পোষণ করেন। বর্তমান রেফারিদের আরও যোগ্য করে তোলবার জন্য তিনি নিজেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তার মতে সময় সময় ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলেও কলকাতার রেফারিদের মান ভারতের যে কোন অংশের চেয়ে বেশ উন্নত। বিদেশে ও বাংলার বাইরের আসরে তারা যথেষ্ট প্রশংসা পান। তার দৃঢ় আশা ৭ জুলাইয়ের মহাসমরের রেফারি সসম্মানে উত্তীর্ণ হবেন। ●



■ মহাসমরে এক খেলার পরে পুলিশ পাহারায় রেফারি/পাহাড়ী

বড় ম্যাচে পুলিশ বাহিনী একেবারে নিধিরাম সর্দার!

অশোক চট্টোপাধ্যায়: 'একেবারে থ্যাঙ্কলেস জব। ডিপার্টমেন্টের বাইরে পুলিশের কাজের প্রশংসা করে এমন লোক বোধহয় বিশেষ মিলবে না।' কলকাতা ফুটবল অনেকেরই 'মাথাব্যথা', যন্ত্রণা কাতরদের দলে পুলিশ বাহিনী অন্যতম।

কলকাতা ফুটবল, বিশেষ করে বড় ম্যাচে দর্শকদের সুশৃঙ্খল রাখার ঝক্কি ঝামেলা পুলিশকে যেভাবে পোহাতে হয় এবং কাজ করতে গিয়ে যেসব অসুবিধের লিস্টি কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (হেডকোয়ার্টার্স) বীরেন সাহা দিচ্ছিলেন, তাতে মনে হয়েছে, ঢাল তলোয়ার হাতে থাকা সত্ত্বেও পুলিশ বাহিনী একেবারে নিধিরাম সর্দার।

অব্যবস্থার তালিকায় আছে—গ্যালারি ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। এখানে ওখানে ভাঙা, দর্শকের চাপে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়াটাও আশ্চর্য হবার মত ঘটনা নয়। দ্বিতীয়ত চারদিকের কাঠের বেড়া ঠিক মত পোক্ত নয় মাঠে অবাঞ্ছিত দর্শক প্রবেশ আটকাতে হলে সারা মাঠটা পুলিশ দিয়ে ঘিরে দেওয়া প্রয়োজন—'সেটা সম্ভব নয়'। তিন নম্বর, এতোগুলো লোক মাঠে খেলা দেখতে বা বা টিকিট কাটতে আসছে, তাদের তৃষ্ণা মেটাবার ব্যবস্থা নেই—প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দিতে হলে লাজলজ্জা ভোলা ছাড়া অন্য পথ নেই। চার নম্বর, প্রদর্শনী ম্যাচ বা ইস্ট-বেঙ্গল: মোহনবাগানের সাধারণ ম্যাচেও যে শাল খুঁটির ঘেড়া তৈরি হয়—সেটা করে পি ডব্লু ডি. পুলিশের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করাটা তাদের কাছে বাহুল্য মনে হয়। অতএব পুলিশকেই তাদের পেছনে ঘুরে ঘুরে 'বাবা বাছা' বলে কাজটা ওর মধ্যেই যথাসাধ্য মনোমত করিয়ে নিতে হয়। মাঠের মধ্যে ফেনসিংও সব জায়গায় ঠিক মত নয়।

এছাড়াও আরো ছোটোখাটো অভিযোগ রয়েছে পুলিশ তরফের। এদিকে কর্তব্যের পরিধি দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। প্রদর্শনী খেলার টিকিট বিক্রি হলে সে সময় থেকে পুলিশ ব্যবস্থা: লটারি করে টিকিট বিক্রি হলেও ঝামেলাটা কমে না, তখন দুয়ের বদলে দশ জায়গায় পাহারা দিতে হয়। পাহারা বসাতে হয় আই এফ এ অফিসে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের টেন্টে—সদস্যদের মধ্যে টিকিট বিক্রির কাজেও লাঠি হাতে পুলিশকে লাইন ম্যানেজ করতে হয়। খেলার আগে বা পরে রেফারিদের তাঁবু পাহারা দিতে হয়—বেচারাদের হাতে ক্ষমতা বেশী বলেই অসন্তোষের ধকলটাও



বীরেন সাহা / শেখর ভট্টাচার্য

ওদের সামলাতে হয়। যে দল বড় ম্যাচে হারলো, তাদের মেসে বা টেন্টেও চাই পুলিশ—বলা যায় না কখন কি ঘটে, হতাশা থেকে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে। খেলার দিন দু' দলের খেলোয়াড় আর রেফারিদের মাঠে নিয়ে আসার দায়িত্ব পুলিশের। গত বছর উয়াড়ির কাছে ইস্টবেঙ্গল সিজনের শুরুতেই হেরে যাবার পর ময়দান এলাকা মিনি কুরুক্ষেত্রের রূপ নিয়েছিল, সে ঝামেলা পুলিশ ছাড়া আর কে সামাল দেবে?

ডেপুটি কমিশনার বি কে সাহা একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, খেলোয়াড়রা মাঠে ঢোকার সময় বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ঢুকবেন—আপত্তি করা যাবে না। গতবছর এ ধরনের আপত্তির ফলে গেটের মুখ থেকে সুরজিত সেনগুপ্ত গোঁসা করে চলে গিয়েছিলেন। আবার তাকে খুঁজে বের করে, অপরাধ স্বীকার করে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল।

বড় দলের খেলা থাকলে ট্রামে, বাসে টিকিট কাটাটা অনেকেই বাহুল্য বোধ করে। খেলা ভাঙার পর ঘণ্টাখানেক ট্রামের সংখ্যা অনেক কমে যায়। প্রাইভেট বাসের মালিক-দের কাছ থেকে পুলিশ দপ্তরে প্রায়ই লম্বা লম্বা চিঠি আসে—কিছু একটা প্রতিকারের জন্য। তাই নানা জায়গায় পুলিশ পিকেট রাখতে হয়।

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলা প্রদর্শনী ম্যাচ না হয়ে সাধারণ ম্যাচ হওয়ার সুবিধে কি? পুলিস তরফের বক্তব্য, লোক কম, তাই ঝামেলাও কম। সদস্য সংখ্যা তো আর রাতারাতি বাড়ে না। টিকিট বিক্রির পরিমাণটাও কম। তবু ওই ম্যাচের গুরুত্ব বুঝে ব্যারিকেড তৈরি, দু'আড়াই হাজার পুলিশ ব্যবস্থা—সবই থাকে। বড় ম্যাচে 'আমাদের ব্যবস্থা প্রায় নিশ্ছিদ্র থাকে, ফলে ঝামেলা কোন কিছু হয় না বললেই চলে।'

পুলিশের বিরুদ্ধে দুটি ময়দানী অভিযোগ—পুলিশ মাঠে লোক ঢোকায়, দ্বিতীয় অভিযোগ প্রদর্শনী খেলার টিকিটের যতই হাহাকার থাক, অফিসার এমন কি কনস্টেবল-দের প্যান্টের পকেট থেকেও গোছা গোছা টিকিট বেরোনোটা বিরল ঘটনা নয়। এ দুটো অভিযোগই বি কে সাহা নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তার কথায়, 'টিকিটের জন্য আমার মত অনেক অফিসারের কাছেই বহুজন ধর্ণা দেয়। সকলের ধারণা আমরা টিকিটের খনি। কথাটা বেমালুম মিথ্যে। আর লোক ঢোকানোর কথা বলছেন—দেখেছেন কখনো? একটা কথাই বলা যায়, 'বুঝ লোক যে জানহ সন্ধান।'

কানাই দাস সবুজ গ্যালারিতে গত দশ বছর খেলা দেখছেন। কানাইবাবুর কথায় পুলিশের ডাণ্ডা খেয়েছেন বছর পিছু গড়ে দশটা করে ধরলে একশোটা। মাউন্টেড পুলিশের ঘোড়ার দাপটে জেনুইন লাইন ভেঙে বেরিয়ে পড়ে অন্তত বার পনেরো খেলা দেখার সুযোগ হারিয়েছেন। তাই 'মামু'দের দেখলেই পিত্তি জলে যায়।' মোহনবাগানের এক সদস্যের কথা, 'পুলিশী ব্যবস্থা নিয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকার কথা নয়।' ●



পুলিস শান্তি বজায় রাখতে সচেষ্ট। পিছনে মারমুখী দর্শক ঢিল হাতে

কি করে ফুটবলার হওয়া যায়

স্বরাজ ঘোষ ।

ফুটবলের প্রথম সংজ্ঞাই হল পায়ে বল। তারপরই বলকে লাথি মারা। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই তার সহজাত প্রবৃত্তি থাকে হাত-পা ছোঁড়ার তারপর সে যখন সুস্থ অবস্থায় হাঁটতে শেখে, তখন কোন এক গোলাকার বস্তু দেখলে সচেতন অথবা অচেতন অবস্থায়ই হোক সে সেটাকে সজোরে এক লাথি মারে। সহজাত প্রবৃত্তির মধ্য দিয়েই সহজাত প্রতিভা জেগে ওঠে। সেই সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলার জন্য খেলোয়াড়ী জীবনের প্রথম পর্ব অর্থাৎ ১০-১২ বছর থেকেই আদর্শ শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন। আগেই বলেছি, খেলার পুঁথি পড়ে ফুটবল খেলা শেখা যায় না। 'খেলা-শেখা' কথাটি সামগ্রিক কথা, খেলা সাধের শুধু নয়, সাধোরও। এই খেলাকে বলে শ্রম-সাধ্য খেলা। এ খেলা শুধু দেহেরই নয়, স্বভাবেরও। সেজন্য এটা সাধনারও। আবার এই খেলা একটি সুচারু শিল্পও। এই খেলা যেমন বেগবান ও গতিশীল, তেমনই বিশুদ্ধ। চরিত্র সেখানে মূল উপকরণ।

শিক্ষার্থীর জীবনের সুষম বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীকে গুরুর সঠিক ধারণা দিতে হয়। সেটা হল, স্টপ নট, টিল দ্য গোল ইজ রিচড। অর্থাৎ 'গোলে না পৌঁছান অবধি থামবে না।' এটাই খেলার মূল লক্ষ্য। কাজেই শিক্ষার্থীর গুরু শিক্ষার্থীর কানে এই মন্ত্র দিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীর সেই মন্ত্রানুসারে এগোতে হলে কতকগুলো অলঙ্কার দরকার। সেগুলো: (যে যার বয়স অনুযায়ী) ক্ষিপ্র গতিতে দৌড়, সজোরে কিক, দীর্ঘ ও উচ্চ লম্ফ ও সুস্বাস্থ্য এসমস্ত অলঙ্কারের অধিকারী হলে, ভাবতেই পারি না যে, তার সাধনার বলে বড় খেলোয়াড় না হওয়ার কোন অন্তরায় আছে।

সাধনা মানেই অনুশীলন। তবে প্রথম পর্ব থেকেই মেকানিক্যাল কায়দায় নয়। সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রতিভাকে বজায় রেখে। যেমন ধরা যেতে পারে, সজোরে কিক না মারলে গোল হওয়া সম্ভব নয় অথবা সজোরে সট না মারলে ব্যাক পজিসনের লং কিক হয় না, এমন কি লং সেণ্টার করতে গেলেও জোরের সঙ্গে সট মারতে হয়। অর্থাৎ কিক বা সটের চরম পর্যায় হল—বাংলা কথায়, সজোরে সট। ইংরেজিতে যেমন ড্রাইভ বা পাঞ্চ সট ইত্যাদি। সহজাত প্রবৃত্তিতে এই সটগুলো মারতে হলে, শিক্ষার্থীর সামনে (বয়স অনুযায়ী ১০ থেকে ১২ বছর অবধি ৪ নম্বরের বল, জুতো—বুট নয়, কেটস) বলকে রেখে প্রথম দাঁড়ান অবস্থায়, পরে দৌড়ান অবস্থায় আস্তে সট থেকে ক্রমানুসারে জোরে সট মারার প্রতি অভ্যাস করাতে হয়। এ ব্যাপারে সট মারার আগে কেমন করে দৌড়তে হবে ও সট মারতে হলে ডান বা বাঁ পায়ের অবস্থান কি হবে, তা প্রশিক্ষণের কোন প্রয়োজন নেই। যাক না বল এদিক বা ওদিক। হোক না পায়ে ব্যথা। ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনা হতেই চলে যাবে। গ্রাউণ্ড সটই হোক আর হাফ ভলি, ফুল ভলিই হোক, যেদিকে যাক আপত্তি নেই। ওই যে বলেছি, সঠিক ধারণা দিয়ে দিতে হয়। অর্থাৎ সব কিছুই চরম পর্যায়ে পৌঁছতে হবে। শিক্ষকের লার্নিং প্রসিড বা সিকোয়েন্স অনুযায়ী সে তো শিক্ষার্থীকে সোজা পথে নিয়ে যাবেই। শিক্ষার্থীর প্রথম পর্বে যে সট বা বল কন্ট্রোল সঠিকভাবে হয় না, তা শিক্ষক আপন মনের ধ্যান দিয়ে সঠিক করে নেবেন। এমন কি শিক্ষার্থী অধ্যবসায় বশত সহজাত প্রতিভাকে বিফল করতে সঙ্কোচ করবে না। শিক্ষার্থীর প্রথম জীবনেই জোর সটের প্রতি যে প্রবণতা জন্মায়, তা ক্রমবিকাশ হতে হতে পেলে, বব চাল'টন, ডি স্টিফানো, হিদেকুটি, পুসকাস, কাঁসস, ক্রুইফ, কেম্পেস প্রমুখের পর্যায় পৌঁছায়।

প্রথম জীবন থেকেই মেকানিক্যাল কায়দায় ফুটবলের সুটিং, পাসিং, বল কন্ট্রোল ইত্যাদি শিখতে গেলে শিক্ষার্থীর শক্তির স্ফুরণ বেশীর ভাগ সময়ই বাধা প্রাপ্ত হয়, তার বিকাশন্মুখ সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হয়। আবার সাবলীল ভঙ্গিতে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষক প্রয়োজন বোধে শিক্ষার্থীকে ভুল করবার স্বাধীনতা পর্যন্ত দেবেন। নইলে সে যে সহজ গতিতে গড়ে উঠতে পারবে না। এমনকি শিক্ষার্থীকে ভাবনা চিন্তা করবারও সুযোগ দিতে হবে। তাতেই তো সে সৃজনশীল হতে পারবে। মেকানিক্যাল কায়দায় খেলা শিখতে গেলে শিক্ষার্থীর সব সময়ই শিক্ষকের চিন্তার উপর নির্ভর করতে হবে, কারণ সে একটা যন্ত্রে পরিণত হয়। সে সৃজনশীল খেলোয়াড় হতে পারে না, সে একটা 'ডামি' খেলোয়াড়ে পরিণত হয়। এটাই হল শিক্ষকের অসঙ্গত শাসন বা মেকানিক্যাল কায়দার কুফল। আজ আমার ছোট ছোট ভাইরা এখন যে খেলা দেখছো, তাই তোমাদের কানে নিশ্চয়ই বাজছে, আমাদের দেশের খেলার মানের ক্রমাবনতি।

আমি বিশ্বাস করি আদর্শ জ্ঞানী শিক্ষক যদি তোমরা সংগ্রহ করতে পার ও সহজাত প্রতিভাকে প্রাধান্য দিয়ে সহজ গতিতে গড়ে উঠতে পার, তাহলে জাতীয় খেলোয়াড় পর্যন্ত হওয়ার কোন বাধাই নেই।

তোমরা জেনে আরও উৎসাহিত হবে যে প্রথম জীবনে বিশ্বের সব খেলোয়াড়ই ছাত্রাবস্থায় থাকে। তারা স্কুলের পাঠে ইস্তফা দিয়ে ফুটবল প্রশিক্ষণে বেশী সময় ব্যয় করে না। আজ যারা বিশ্বজয়ী খেলোয়াড় হয়েছেন, যেমন স্ট্যানলি ম্যাথুজ, টম ফিনে, উয়েসিলার, পেলে, পুসকাস, বিলি রাইট প্রমুখ থেকে আধুনিক নেলিনহো, রিভেলিনো, বার্তোনি, লুকে প্রমুখ পর্যন্ত সবাই প্রায় ছাত্র জীবন কাটিয়েছেন। তারা সেদিন জানতেন না যে কোনদিন তারা বিশ্ব বিখ্যাত খেলোয়াড় হবেন। তাদের প্রতিভা স্কুল জীবনেই সহজ গতিতে



প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের ফুটবল—শিল্পীর চোখে



ডাইনে—টম ফিনের ছাত্রাবস্থায় (১২ বছর বয়সে) এক স্কুল কাপ ফাইনালের খেলায় বিজয়ী হয়ে জীবনে প্রথম মেডেলটি পান। তিনি গর্বের সঙ্গে মেডেলটি গলায় পরে আছেন। পাশের ছবি—যখন তিনি ইংল্যাণ্ডের জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেই সময় তার ক্লাব প্রেস্টন নর্থ এণ্ড ক্লাবের একটি প্রতিযোগিতামূলক খেলার দৃশ্য

গড়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে তোমরা পেলের প্রথম জীবনের অনেক গল্প জান। তার তখন একটা বল কেনবারও ক্ষমতা ছিলনা, ভালভাবে সংসারও চলত না। তোমরা কি কোন বইয়েও পড়েছ যে ওই অবস্থার মধ্যে পেলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই খেলার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? জেনে রেখো, পেলে বিশ্বকাপে ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৭০ সাল অবধি ব্রাজিল দলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কিন্তু ব্রাজিল দলের প্রশিক্ষক ভিনসেণ্ট ফিওলা বা জাগালো পেলের প্রতিভাকে বজায় রেখেই তার গেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা ক্রীড়া প্রশাসন কম্পোজ করেছেন। সেইভাবে উপরোক্ত বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়গণ খেলে গেছেন। এই ধরনের অনেক কথা আমাদের দেশের অতীত দিনের প্রথিতযশা খেলোয়াড়দের ব্যাপারে প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে ভারতীয় 'ফুটবলের যাদুকর' সামাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখছি। তিনি যখন স্কুলে যেতেন তখন একটা টেনিস বল পকেটে করে নিতেন, আর রাস্তা দিয়ে বলটাকে সট মারতে মারতে চলতেন। এমনকি কোন লোক সামনে পড়লে তাকে তিনি অবলীলাক্রমে বল নিয়ে কাটাতেন। এসব এখন ইতিহাস হয়ে গেছে। তবে তা বর্জিত হয়ে গেছে। দুঃখের কথা, বর্তমানে অতীত বা ইতিহাসের মূল্য কে দিচ্ছে? আমরা জানি, যা বর্জিত হয় না তা জাতীয় বা ইতিহাস আর যা বর্জিত হয় তা আধুনিক বা সমকালীন।

এসব কথা কেন লিখলাম? শিক্ষার উপাদান সংগ্রহের চাইতে উপাদানের সংগ্রহ, গ্রহণ, ধারণ ও স্বায়ত্তীকরণের মূল যন্ত্র যে মন, তার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার। শিক্ষা লাভের প্রধান হাতিয়ার মন। সেই মনই দুর্দমনীয়। তাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে তো? ফুটবল খেলতে হলে, দেহ ও মন সমান্তরাল-ভাবে চলে। কাজেই এই খেলার তাগিদে দেহের প্রয়োজন, মনের প্রয়োজন, ফুটবলের অধিগত বিদ্যা ও স্কিলগুলোর সংজ্ঞা সংক্ষেপে ক্রমানুসারে লিখব।

(চলবে)

হরলিক্‌স



রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্য পুষ্টি যোগায়। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

হরলিক্‌স নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার পরিবারের পুষ্টিবৃদ্ধি ক'রে প্রতিরোধশক্তি যোগাবে এবং তাদের পূর্ণ স্বাস্থ্যবান রাখবে। এই স্বাস্থ্যই হ'ল সাফল্য ও সুখ। স্বাস্থ্যই আপনাকে কর্মঠ ও সক্রিয় রাখে এবং নিশ্চিন্ত ক'রে তোলে।

হরলিক্‌স···একমাত্র জিনিষ যা সারা বিশ্বের ডাক্তাররা সুপারিশ করেন। এটি হ'ল একমাত্র বস্তু, যা আপনাকে এত বেশী পুষ্টি যোগাতে পারে; কারণ, অতুলনীয় হরলিক্‌স পদ্ধতিতে এর মূল্যবান সুস্বাদু উপাদানগুলি সংমিশ্রিত হয়ে, এর স্বাভাবিক সংগুণগুলি অপরিবর্তিত রাখে এবং সহজেই হজম হয়।

সেইজন্যেই সুচিত্রা তার পারিবারিক জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছে, হরলিক্‌সকে। সে জানে, হরলিক্‌স সকলের স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ।

সুচিত্রার মতই আপনার পরিবারের সকলকে প্রতিদিন হরলিক্‌স খেতে দিন এবং বছরের পর বছর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতি লক্ষ্য করুন।

"হরলিক্‌স পুষ্টির মূল উৎস। এটি বছরের পর বছর সুস্থ-স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখে। আপনার পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলারজন্য এবং তাদের দিনের পর দিন সুস্থ সবল ও সক্রিয় রাখতে আমি হরলিকস ব্যবহার করতে সুপারিশ করি।"



Hx-4548-Ben

হরলিক্‌স মহান শক্তিদাতা

হরলিক্‌স একটা রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।

এখনকার ফুটবল দেখে নিমু বসু বিরক্ত

চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সে যুগে প্রচারের রাস্তাটা এত ব্যাপক ছিল না ; লোক-চক্ষুর সম্মুখে আসতে হলে কিম্বা রসিক-মহলের মণিকোঠায় জায়গা করে নিতে হলে প্রয়োজন হত অকৃত্রিম নিষ্ঠা, সাধনা আর পরিশ্রমের।

সরস্বতীর আশীর্বাদ ছিল তাদের কাছে সবকিছু। লক্ষ্মীর আশীর্বাদে ফুলে ফেঁপে সার্থক খেলোয়াড় হবার রাস্তা ছিল বন্ধ প্রায়।

নিমু বসু এমনই একজন খেলোয়াড়। পোশাকী নাম নির্মল বসু। কিন্তু ফুটবল রসিকরা চেনেন নিমু বসু নামেই।

চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে কলকাতা ময়দানের ডাকসাইটে লেফট্ ইন নিমু বসু আজ জ'াকজমকের এই কলকাতা ময়দান থেকে অনেক দূরে। কিন্তু কেন? প্রশ্নটি রাখতেই নিমুদা বললেন 'ভাল লাগে না ; ইচ্ছেও হয় না। কোথায় সেই প্রাণ! কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সেই খেলা। শুধু তো লোকের ভিড় আর বাইরের চাকচিক্য।'

সোফার ওপর নিজেকে আরও একটু টান-টান করে নিয়ে সাতাম বছরের নিমুদা আবার শুরু করলেন 'আমাদের সময় টিম ছিল কম, আর রিটার্ন লিগ ছিল। সুতরাং প্রত্যেকটি টিমই জান্‌-প্রাণ লড়িয়ে খেলত, মাঝারি বা ছোট দলের খেলোয়াড়দের মূল লক্ষ্য ছিল মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান স্পোর্টিংকে রুখে দেওয়া। আর ওই সময়ই ঠিক হত যে খেলোয়াড়েরা পরের বছর কোথায় খেলবে। এখনকার মত পয়েন্ট ভাগ বঁাটোয়ারা তখন চিন্তাও করা যেত না।'

ফুটবলের প্রেমে কবে পড়লেন—নিমুদা বললেন—'সেই কবেকার কথা, তখন আমি জগবন্ধু স্কুলের ছাত্র। তখন থেকেই বল নিয়ে একটু আধটু দৌড়োদৌড়ি করতাম, তারপর ক্লাস সিক্স-এ স্কুল পাল্টে গেলাম তীর্থপতিতে। স্কুলের টুকটাক খেলা তো খেলতামই, এছাড়া প্রদ্যুম্ন মুখোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক ফুটবলকে ভীষণ ভালবাসতেন। বিডন স্কোয়ার পার্কে তিনি প্রতিবছর একটা হাইটের টুর্নামেন্ট করতেন। যতদিন ওই নির্দিষ্ট হাইটের মধ্যে আমার উচ্চতা ছিল ততদিন পর্যন্ত নিয়মিত খেলেছি। আর ওই প্রতিযোগিতা থেকে পরবর্তীকালে অনেক খেলোয়াড় কলকাতা ময়দানে তাদের পায়ের ছাপ রেখেছেন।' নিমুদাকে প্রায় থামিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম 'যেমন'—

'এই তো মুস্কিল, কতদিন আগের কথা, দু-একটি নাম মনে পড়ছে, আবার দুর্ভাগ্যবশত অনেক নামই মনে পড়ছে না। তবুও শম্ভু মুখার্জি, সুশান্ত মুখার্জি নামটা চট্ করে মনে পড়ল এরকম আরও অনেকেই আছেন।'

তারপর—

'ক্লাস সেভেনে পড়তেই আন্তঃস্কুল প্রতি-যোগিতায় খেলার সুযোগ পেলাম। তখন আই এফ এ-র অন্তর্ভুক্ত একটা সংস্থা লিগ নক-আউট প্রতিযোগিতার আয়োজন করত। সংস্থাটির নাম ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস অ্যাসো-সিয়েশন তাতে চারবার খেলেছি ; আর আমার অধিনায়কত্বে তীর্থপতি স্কুল দুবার চ্যাম্পিয়ন।'

কলকাতা ময়দানে এলেন কবে?

১৯৪০ সাল। দ্বিতীয় ডিভিসনের একটি দলে, গ্রীয়ারে। মাত্র একটি বছর, তারপরই ডাক পড়ল মোহনবাগান থেকে।'

আবার থামিয়ে দিলাম। বললাম হঁ্যা, আপনার পরিচিতির সঙ্গে মোহনবাগান আর ভবানীপুরের সম্পর্ক তো অবিচ্ছেদ্য।'

'ঠিক! যা বলছিলাম, সেটা '১৯৪১ সাল। বলাইদা (বলাইদাস চ্যাটার্জি) বললেন মোহনবাগানে খেলতে হবে। প্রথমে কিন্তু রাজি হইনি। কারণ জোসেফ আর ল্যাংচাদা তখন মোহনবাগানের দুই ইনসাইড। তাদের উপস্থিতিতে আমার সুযোগ হওয়া আর স্বপ্ন দেখা দুটো একই ব্যাপার। তবু যেতে হল। কারণ বলাইদা আর বাবা ছিলেন দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাই ওই যুগলবন্দীর আদেশে আমাকে যেতেই হল।'

'কিন্তু বছরটা কিরকম......

এবার নিমুদা আমাকে থামালেন। বললেন, 'বুঝেছি তুমি কি জানতে চাও। শোন তবে, আমি সে বছর মাত্র চারটে গেম খেলি।'

'তাহলে গোড়ায় যা ভেবেছিলেন সেটাই......'

'হঁ্যা, সেটাই সত্যি হল।'

'৪২-এ ভাবলাম বুঝি এবছরটাও এভাবে কাটবে, কারণ তিনটে গেম হয়ে গেছে, চান্স পাইনি। মরশুমের চতুর্থ খেলা। ক্যালকাটা টিমের বিরুদ্ধে। খেলা ক্যালকাটা মাঠে। (এখন যেটা মোহনবাগান)। বলে রাখি, তখন ইস্টবেঙ্গল আর মোহন-বাগানের ছিল একই মাঠ। এখন সেটা ইস্টবেঙ্গল এরিয়ান্স মাঠ। আর এখন যেটা এরিয়ান্স টেণ্ট তখন সেটি ছিল মোহনবাগান টেণ্ট। যাই হোক টেণ্টে গেলাম, জানি তো ড্রেস করে দর্শক হয়ে খেলা দেখবো। কিন্তু হল উল্টো। টেণ্টে যেতেই মালীর কাছে শুনি কানুদা (তৎকালীন ফুটবল সম্পাদক সরোজ দত্ত) ডাকছেন। কানুদা বললেন, ল্যাংচার পা ভাঙ্গা, জোসেফ এখনও আসেনি, তোকে আর অমিয়কে (অমিয় ভট্টাচার্য) ইনসাইড খেলতে হবে। আকাশ থেকে পড়লাম, ভাবলাম মাঠে তো নামি, তারপর যা হবার তাই হবে। তারপর যা হল তা আমার খেলোয়াড়ী জীবনের স্মরণীয় ঘটনা।'

'সেদিন মোহনবাগান ৪—০ গোলে জিতল। আর সেই চারটে গোলই আমার দেওয়া। ক্যালকাটাকে তছনছ করে দিলাম। কানুদা জোসেফকে নিয়মিত মাঠে আসতে বারণ করলেন। বললেন, 'খবর দিলে এস।' কারণ ও খড়্গপুর থেকে আসত, জোসেফ সেই থেকে প্রায় মাঠে আসা বন্ধ করল। আর সেই থেকে '৪৫ সাল পর্যন্ত একটানা খেলেছি ; '৪৩ সালে আমার দেওয়া গোলে ইস্টবেঙ্গল হারে মোহনবাগান সেবার লিগ চ্যাম্পিয়ন। ৪৪-এ আবার লিগ চ্যাম্পিয়ন। মহ-মেডানের সঙ্গে ফাইনালে মান্নার ফ্রি-কিকে আমরা জিতি। '৪৪-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবলে বাংলা দলেও আমার ঠ'াই হয়েছিল। ১৯৪৫ পর্যন্ত মোহনবাগানে কাটালাম।'

ভবানীপুর ক্লাবেও তো আপনার বেশ ক'টি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন কেটেছে—



'স্বর্ণোজ্জ্বল দিন কিনা জানি না, তবে বড় মধুর কটি দিন আমার ভবানীপুর দলে কেটেছে। ১৯৪৬ সাল থেকে ৫৬ সাল, এই একটানা এগারটি বছর আমার ভবানী-পুরেই কেটেছে। '৪৮, '৪৯ সালে আমি ছিলাম ক্যাপ্টেন ; মনে পড়ছে ১৯৪৮ সালে শিল্ডের সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে হেরে রানার্স হলাম। ৪৭ সালে লিগে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হেরে লিগ রানার্স হই।'

সঙ্গে সঙ্গে নিমুদা ১৯৪৪ সালের মোহন-বাগান টিমটা জানালেন:

গোলে—ডি সেন (বকাইদা), ব্যাক—শরৎ দাস, মান্না ; হাফ—অনিল দে, টি আও, স্বিপেন সেন ; ফরোয়ার্ড—নির্মল চ্যাটার্জি, সামু রায়, বিজন বসু, আমি, নির্মল মুখার্জি। এছাড়া ভবানীপুরে পেয়েছি গিরীন বসু, অমল মজুমদার, রাসবিহারী রায়, ইসমাইল, রবি দাস, তাজ মহম্মদ এইরকম আরো অনেককে।

এখনকার খেলা এবং নানা ব্যাপার নিয়ে নিমুবাবু বিরক্ত। বললেন: 'বড় দুঃখ হয়, খেলায় প্রাণ নেই, খেলোয়াড়দের সেই তেজ নেই। শুধু আছে বাইরের ঝলকানি। প্রশিক্ষক আর প্রশিক্ষণের রকম সকম দেখে কেমন যেন অবাক লাগে, মরশুমের, গোড়ায় ওই গোল পোস্ট পুজো, অমুক-তমুক দেখে হাসিও পায়। কৈ, আমাদের সময় তো এসব ছিল না। কিন্তু তখন খেলার নামে খেলাই হত। অন্য কিছু নয়। আর সেই কারণেই তো মাঠ প্রায় ত্যাগ করেছি ; শুধু অফিসের খেলা ছাড়া।

কোচবিহারের ফুটবল

উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি: অতীতে উত্তর-বঙ্গের পাঁচ জেলার খেলাধূলার প্রতিযোগিতার দৌড়ে এবং ঐতিহ্যের সোপানে কোচবিহার জেলা যে স্থান দখল বা সম্মান অর্জন করেছিল বর্তমানে তার অনেকাংশেই ম্লান হতে চলেছে। উত্তরবঙ্গের ক্রীড়া জগতে কোচবিহারকে সেই আগেকার অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার জন্য এখানকার বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনের ক্রীড়াবিদরা বিশেষ করে জেলা ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থা নতুন চিন্তা এবং উদ্যোগ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

এই সংস্থার পরিচালনায় '৭৫ থেকে সারা বছর ধরে জেলার সম্ভাবনাময় কিশোর এবং তরুণ ফুটবল শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনাবাসিক ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শিবির সংগঠিত হচ্ছে। বর্তমানে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে একশো কুড়িজন শিক্ষার্থী প্রকৃত ফুটবলার হিসাবে গড়ে ওঠার শপথ নিয়ে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রশি-ক্ষণ কেন্দ্রের কোচ বিনয় নারায়ণের কাছ থেকে ভবিষ্যতের ফুটবলাররা অনুধাবন করতে শিখেছে যে একজন ফুটবলারের জন্য নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন কতখানি। আরও বহু কিশোর এবং তরুণ এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে আগ্রহী। এই আগ্রহকে উৎসাহ যোগাচ্ছেন তাদের অভিভাবকেরাও। জেলা সদরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের চাপ কমানোর জন্য কোচবিহারের ক্রীড়ামোদীরা মনে করছেন এ ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উত্তর-বঙ্গের অন্য জেলাগুলির ঈর্ষার ব্যাপার হয়ে উঠবে। জেলা সংস্থা ঠিক করেছে কিছু-দিনের মধ্যেই তারা আর এক মহকুমা শহর তুফানগঞ্জে অনুরূপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করবে। স্থানীয় ক্রীড়াবিদরা মনে করেন, জেলা সংস্থা যদি বর্তমানের নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণের প্রয়াস এবং চর্চা অব্যাহত রাখতে পারে তবে দু'তিন বছরের মধ্যেই কোচবিহার তার পুরনো মর্যাদা ফিরে পাবে।

এবছরের সিনিয়র ফুটবল লিগ জুন মাসের মাঝামাঝি শুরু হওয়ার কথা। ছাড়পত্র স্বাক্ষর এবছর অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। মোট ৭১জন ফুটবলার দল ত্যাগ করে অন্য দলে চলে গেছেন। দলবদলের পালায় আপাত দৃষ্টিতে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চ্যাম্পিয়নশিপের দাবিদারদের অন্যতম উদয়ণ সংঘ। অন্য প্রধান গুড়িয়াহাটী প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠে শেষ প্রহরে খেলোয়াড়দের আগলাতে পেরেছে। এবারে কাগজে কলমে শক্তিশালী দল মৈত্রী সংঘ। উত্তরবঙ্গের ফুটবল জগতের কিংবদন্তী দল আননোন ক্লাব এবছরে দল গড়েছে জেলার বাছাই জুনিয়র খেলোয়াড়দের নিয়ে। এরা যেকোন মুহূর্তে যেকোন নামী দলকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে পারে।

মাথাভাঙ্গায়

খেলার আধুনিক কৌশলকে সুদূর গ্রামা-ঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার অভিপ্রায়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থা ২৬ মে থেকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া-সংস্থার সহায়তায় মাথাভাঙ্গা শহরে দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছে। এই কেন্দ্রের তত্ত্বাবধান করবেন জেলা সংস্থার আর একজন প্রশিক্ষক দেবব্রত মজুমদার।

জেলা সংস্থা এই ব্যয়বহুল প্রশিক্ষণ পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আই এফ এর কাছে অনুরোধ করে পেয়েছে দশটি ফুটবল। সাহায্য চাওয়া হয়েছে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের কাছেও।

এবছরের জুনিয়র এবং সাব-জুনিয়র ফুটবল লিগ সম্প্রতি শেষ হয়েছে, বিখ্যাত পাঁচ ফুটবলারের নামাঙ্কিত—চুনী গোস্বামী, বলরাম, পি কে ব্যানার্জি, ভেঙ্কটেশ এবং অরুণ ঘোষ এই পাঁচ দলের মধ্যে। সাব-জুনিয়রে চ্যাম্পিয়নের মুকুট পরেছে ভেঙ্কটেশ দল এবং রানার্সের শিরোপা পেয়েছে চুনী গোস্বামী দল। অরুণ ঘোষ দলের অশোক রায় সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেয়েছে। জুনিয়র বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হবার অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে পি কে ব্যানার্জি দল এবং রানার্স হয়েছে অরুণ ঘোষ দল। চ্যাম্পি-য়ন দলের স্টপার অভিজিৎ কাহালী পেয়েছে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি।



আমার প্রিয় সুভাষ

মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের আগে খেলোয়াড়েরা স্বভাবতই প্রচণ্ড টেনশনের মধ্যে থাকেন। সুভাষ ভৌমিকের পর পর তিন রাত্তির ঘুম হয়নি ম্যাচের আগের রাতে বড় বেশী ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে উঠতে দেরী হয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠেই মনে হল, সে এবার কোন দলে খেলছে—ইস্ট না মোহন? অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, উনিও ভেবে না পেয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত সুরজিতের বাড়িতে টেলিফোন করলেন, 'হ্যাঁরে বিশু, আমি এখন কোন দলে খেলছি রে?, বিশুও চিন্তিতভাবে বলল, 'এতবার দল বদলেছো যে ঠিক খেয়াল করতে পারছি না। তুমি বরং একবার ধীরেন দে-কে টেলিফোন কর।'

ধীরেন দে-কে ফোন করে যেই বলতে গেছে, 'ধীরেনদা……।' অমনি ওদিক থেকে একটা গলা খেঁকিয়ে উঠল, 'না না খেলা দেখার কোন ব্যবস্থা করা যাবে না…… বলেই ফট্ করে ফোন নামিয়ে রাখার শব্দ।

সুভাষ ভোম্বলের মত হাঁ করে বসে রইলেন। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে প্রথমে ইস্টবেঙ্গল টেণ্টে গেলেন। ওদলে ফরোয়ার্ড লাইনে খেলোয়াড়ের ছড়াছড়ি, সুভাষ সেখানে প্লেয়ারস লিস্টে নিজের নাম খুঁজে না পেয়ে মোহনবাগান টেণ্টে গেলেন, সেখানে লিস্টিতে নাম রয়েছে বিদেশ, মানস, শ্যাম আর পায়াসের; স্ট্যাণ্ডবাই রঞ্জিৎ আর তপন।

খুব কাঁচুমাচু মুখ করে সুভাষ মোহনবাগান লনে খানিক ঘুরে বেড়ালেন। দেড়টা নাগাদ দু'দলের খেলোয়াড়রাই গাড়ি করে মাঠে চলে এলো। সুভাষ পালা করে দু'দলের ড্রেসিং রুমেই আধ ঘণ্টা করে বসে রইলেন। দু'দলের কর্মকর্তা কোচ আর খেলোয়াড়দের মধ্যে দারুণ কনফিউশন,সুভাষ সত্যি এবছর কোন দলে সই করেছে। কেউ ভেবে বের করতে পারল না।

সুভাষ খেলা শুরুর সময় মাঠের বাইরে সেণ্টার লাইন বরাবর বসলেন। হাফ টাইমের পরও বিশ মিনিট খেলা হয়ে গেছে, কেউই কোন গোল পায়নি। পি কে ভাবছে সুভাষকে নামালে হত, অরুণ ঘোষও তাই ভাবছে কিন্তু সে যে এবার সত্যি কোন দলের খেলোয়াড়, না কি সে রিটায়ার করেছে, সেটাও কেউ সঠিক করে বলতে পারল না। দু'দলের সমর্থকরাই সুভাষকে মাঠে নামানোর জন্য কোচকে তাড়া দিচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে ওরাও একই রকম বিভ্রান্ত।

স্বপ্নটা এই পর্যন্ত দেখেছি, এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল। সুভাষ ভৌমিক আমার প্রিয় খেলোয়াড়। সে যেবার যে দলে আমি সেবার সেই দলের সমর্থক। তাকে নিয়ে আমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখি এটা তার মধ্যে একটা।

তিতির খাস্তগীর (১৪)





ফুটবল

বাঙাল ঘটির খেলা
দেখবি নাকি বল
শুরু হওয়ার আগে
টিকিট কেটে চল।

বাবি ঘোষ (১২)



যেন কেউ না জেতে

সাতই জুলাই কি হবে—ভাবতে বুকটা দুরু দুরু করছে। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলা তা লিগ বা শিল্ড, কিংবা ডুরাণ্ড বা রোভার্স যাই হোক আমার ভীষণ ভয় হয়। ভয় আমার প্রিয় দল জিতলে যেমন, তেমনি হারলেও। আমার বড়দা মোহনবাগানের মেম্বার, মেজদা ইস্টবেঙ্গলের। বাবাকে আগে দেখতাম ইস্টবেঙ্গল জিতলে আমাকে খুশিমত টফি খেতে দিতেন। এখন ইস্টবেঙ্গল জিতুক হারুক স্পেশাল কিছু বাজার করেন না।

বলছিলুম ভীষণ ভয় হয়। হ্যাঁ, সত্যিই। গতবার লিগে ইস্টবেঙ্গল হারতে দেখি মেজদা দুদিন খায়নি। ওর জন্যে বাবা মাও চুপ। মাও প্রায় না খেয়ে ছিল। আমার জন্যে আমার মা কিন্তু এমন করে না। তাছাড়া আমি ফুটবল টুটবল বড় ভালবাসি না। আমার প্রিয় খেলা দাবা। তাই।

মেজদাকে বড়দা ভীষণ ভালবাসে। তাই বড়দাও বাড়িতে হইচই করেনি ওর কলেজের বন্ধুরা এলে। আমি বললুম, তুমি আনন্দ করছ না কেন? বড়দা বলল, বুমবা চুপ হয়ে আছে। আমি বড় হয়ে কেমন করে ওসব করব। পাশের বাড়ির ববুদা কিন্তু বলেছিল আমায়—'তোর বড়দা আমাদের রেস্টুরেন্টে খাইয়েছে।' আমি ওসব কথা কাউকে বলিনি। মেজদা শুনলে কি ভাববে তাই।

তাই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ম্যাচ এলে ভীষণ খারাপ লাগে। গতবার প্রার্থনা করেছিলাম—ঠাকুর করে দিও।

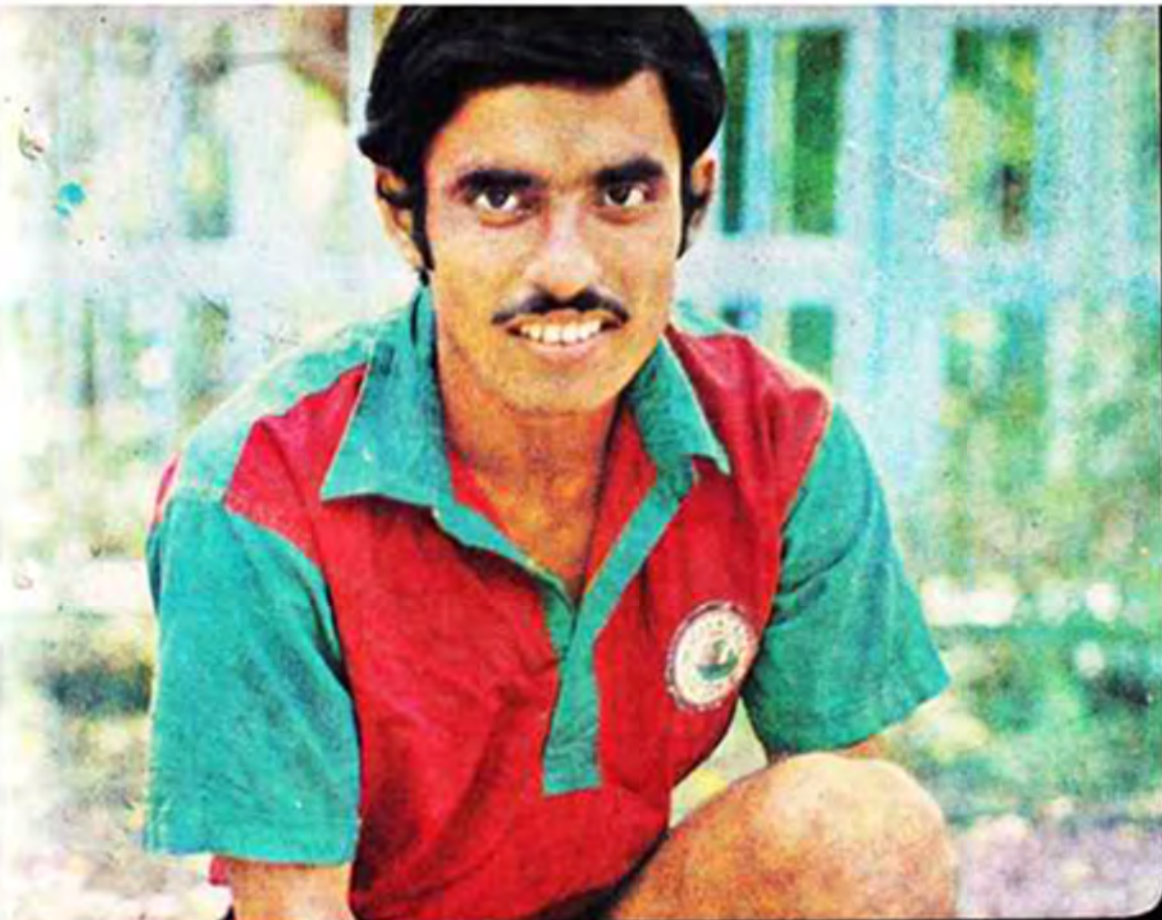
সায়ন্তন দে (১৩)

ইচ্ছে



খেলা দেখার ইচ্ছে বড়
বাপিকে যেই বললুম
মা শুনেছে রান্নাঘরে
তেড়ে এল হালুম।

পূর্ণেন্দু রায় (১৩)



মানস ভট্টাচার্য / শাহাজী



'৭৩ লিগে প্রথম হ্যাটট্রিক
সাবির আলি / অরুণ মুখার্জি



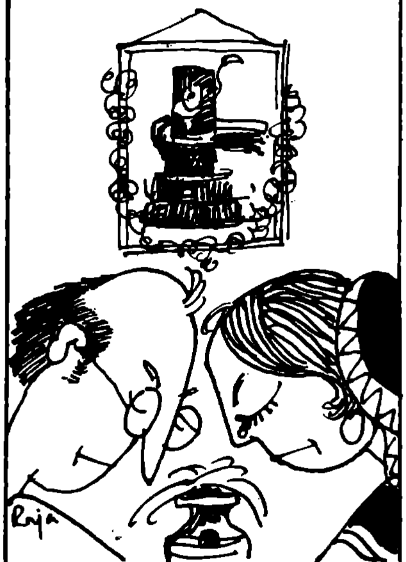
গৌতম সরকার



গতবারের লিগে মোহনবাগান : ইস্টবেঙ্গল : শূন্যে প্রসূন ব্যানার্জি / সমর তরফদার

ছড়রা

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়



লাল হলুদে গ্রীন মেরুনে
লাগছে লড়াই জোর
ব্যস্ত সবাই দুই শিবিরে
সবার চোখেই ঘোর।
'আজকে রণে জিত্‌তে হবে
নয়তো জীবন দান।
সবার কাছে রাখব মোরা
প্রিয় দলের মান।'
বুতী খোকন একই মায়ের
মিষ্টি ছেলে মেয়ে।
দু'জনেতেই পাগল বনে
খেলা দেখতে গিয়ে।
দাদার প্রিয় সবুজ মেরুন
বোনের হলুদ লাল।
দুয়ে মিলে তুলকালামে
কে দেয় বল সামাল:
তাইতো উঠে সাত সকালে
পুজোর ঘরে ঢুকি
বাবা মায়ে মরছে দুজন
কেবল মাথা ঠুকি।
'দোহাই ঠাকুর ড্র করে দাও
আজকে খেলাখানি
ভাইয়ে বোনে মহারণে
আমরা প্রমাদ গনি।'

ফুটবল লিগে কবে কার খেলা

৬ জুলাই: মহমেডান : সালকিয়া ফ্রেণ্ডস (মহমেডান), ভ্রাতৃ সংঘ : কালিঘাট (মোহনবাগান), জর্জ টেলিগ্রাফ : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (ইস্টবেঙ্গল), বি এন আর : কুমারটুলি (রবীন্দ্র সরোবর)।

৭ জুলাই: ইস্টবেঙ্গল : মোহনবাগান (মোহনবাগান)।

৯ জুলাই: মহমেডান এরিয়ান (মহমেডান)।

১০ জুলাই: পুলিশ কুমারটুলি (ইস্টবেঙ্গল), উয়াড়ি : খিদিরপুর (মোহনবাগান)।

১১ জুলাই: হাওড়া ইউনিয়ন : ভ্রাতৃ সংঘ (মোহনবাগান), ইস্টার্ন কম্যাণ্ড : টালিগঞ্জ অগ্রগামী (মহমেডান), কাস্টমস : বি এন আর (ইস্টবেঙ্গল)।

১২ জুলাই: জর্জ টেলিগ্রাফ : পোর্ট ট্রাস্ট (মোহনবাগান), কালিঘাট ইস্টার্ন রেল (ইস্টবেঙ্গল)।

১৩ জুলাই: মোহনবাগান : সালকিয়া ফ্রেণ্ডস (মোহনবাগান), খিদিরপুর : রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব (রবীন্দ্র সরোবর), রাজস্থান : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (ইস্টবেঙ্গল), উয়াড়ি : ক্যালকাটা জিমখানা (মহমেডান)।

১৪ জুলাই: ইস্টবেঙ্গল : কাস্টমস (ইস্টবেঙ্গল), টালিগঞ্জ অগ্রগামী : কুমারটুলি (মোহনবাগান), হাওড়া ইউনিয়ন : পুলিশ (মহমেডান)।

১৬ জুলাই: মোহনবাগান : ক্যালকাটা জিমখানা (মোহনবাগান), জর্জ টেলিগ্রাফ : খিদিরপুর (ইস্টবেঙ্গল), রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব : বি এন আর (মহমেডান)।

'সব খেলার সেরা বাঙালীর .... ফুটবল'



'মোহনবাগানের মেয়ে' ছবি হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের ছেলে হবেনা কেন ?
ভূপেন হাজারিকা

'আমি ইস্টবেঙ্গলকে ভালোবাসি। ইস্ট-বেঙ্গল জিতলে মনে করতে ভালো লাগে আমিই জিতেছি। চার পাঁচ বছর আগেও খেলা দেখেছি, লম্ফ দিয়েছি, এমন কি চিৎকারও ছু'ড়েছি গো-ল ! এইসব ঘটনা ভুলে যাবার নয়। তবে আমার দেখা সেরা দু'জন খেলোয়াড় হলেন শরৎ দাস ও শৈলেন মান্না। মান্না মাঠের মিউজিসিয়ান ছিলেন। এখনও, এই সেদিনের একটি ঘটনা স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকের পুরস্কার নিতে বসুশ্রী সিনেমা হলে হাজির হওয়ার কথা আমার, কিন্তু সময়মত পৌছতে পারিনি। প্রাইজ দিচ্ছিলেন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়। আমি যখন উপস্থিত হয়েছি, মুখ্যমন্ত্রী তখন সভা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। অতএব আমাকে কে পুরস্কার দেবে ? শেষ পর্যন্ত বেস্ট স্পোর্টসম্যান শৈলেন মান্নার হাত থেকে প্রাইজ নিল সেরা মিউজিক ডিরেক্টর ভূপেন হাজারিকা। এমন একটা যোগা-যোগ হবে এবং তৃপ্তি সহকারে পুরস্কারটা হাতে নেব এটা ধারণাও করতে পারিনি।'

মাথায় নেপালী টুপি, পায়ে কোলাপুরি, পরনে লুঙ্গি, গায়ে গুরু পাঞ্জাবি এবং হাতে কিং সাইজ উইলস ফ্লেক নিয়ে যেন অত্যন্ত কাছের এবং অবশ্যই ঘরোয়া 'এক যাযাবর' আমার উল্টোদিকে বসে আছেন। সঙ্গীতের প্রখর ব্যক্তিত্ব ডঃ ভূপেন হাজারিকা এতক্ষণ, প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে তার জীবন-কাহিনী উন্মোচিত করলেন আমাদের সামনে।

তারপর, একসময় আমরা ফুটবলের আলোচনায় ডুবে গেলাম। এবং অবশ্যই ইস্টবেঙ্গল—মোহনবাগানে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ চঞ্চল, সদা হাস্যময় চরিত্রটির খোলস থেকে একজন যুবক বেরিয়ে এল। খুশী ও স্বস্তিতে ভরপুর মন, যেন এইমাত্র তার টিম ম্যাচ জিতে এল।

'উত্তম আমাকে ক্ষেপায়। গতবার, ৬ আগস্ট, ইস্টবেঙ্গল এক গোলে হেরে যাবার পর উত্তম বেশ এক হাত নিয়েছিল আমার উপর। আমিও ছেড়ে দিইনি। জোরের সঙ্গে বলেছি নেক্সট টাইমে দেখা যাবে। এক্ষেত্রে উত্তমের দোসর পুলক ব্যানার্জি, ও একেবারে পাঁড় মোহনবাগান। একটা ভাই আমার আপত্তি আছে—মোহনবাগানের মেয়ে সিনেমা হয়েছে, ইস্টবেঙ্গলের ছেলে হবে না কেন ? এই কারণে আমি প্রথমোক্ত ছবিটা দেখিইনি। হ্যাঁ, বাড়িতেও ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানকে কেন্দ্র করে দারুণ মজার ও আনন্দের ঝগড়া হয়।'

পাঁচ বছর ন্যুইয়র্কে থাকাকালীন ভূপেন হাজারিকা বক্সিংয়ের দুই সম্রাট জো লুই এবং মহম্মদ আলীকে দেখেছেন। উইম্বলডন চাক্ষুস করেছেন, দর্শক হিসাবে হাজির থেকেছেন ফরেস্ট হিলস টেনিস প্রতিযোগি-তাতেও।

একটু থামলেন। আমরা তৃতীয় রাউণ্ড চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিলাম। বললেন, মান্না, আমেদ, সালে, ভেঙ্কটেশ থেকে শুরু করে আজকের হাবিব, সুরজিতের কথা, যাদের পায়ের দ্যুতি এবং ফুটবল-শিল্প তার অন্তরকে আলোকিত করে।

এবারের লিগের একটি দিন। ইস্টবেঙ্গল-এর খেলা। রিলে হচ্ছে। ভূপেন হাজারিকার সেদিন একটি ফাংশনে গান গাইতে যাবার কথা। বাড়ির সামনে গাড়ি প্রস্তুত। এদিকে তিনি তখন রিলে শুনছেন এবং হাত-পা নাড়ছেন। যাবার জন্য তাড়া দিতেই অস্থির হয়ে তিনি বলে উঠলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও, এখনও গোল হয়নি। একটা গোল না হলে আমি ঘর থেকে বেরুবো না। অতঃপর গোল হল। এবং তখনই তিনি 'গোল হয়েছে, এবার চল' বলে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

কানাডা, আমেরিকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, লণ্ডনের বিভিন্ন জায়গায় নানা য়ুনিভার্সিটি ও সংস্থার আমন্ত্রণে গান গাইবার জন্য পল রোবসনের যোগ্য শিষ্য গত ৮ জুন কলকাতা ছেড়ে পাড়ি দিয়েছেন বিদেশের মাটিতে। এই মুহূর্তে তিনি রয়েছেন ন্যুইয়র্কে। তার উদাত্ত গলায় 'মানুষ মানুষেরই জন্যে' হয়তো মোহিত করে রাখছে দর্শক-শ্রোতাদের। তার দিনলিপি ভরে রয়েছে দারুণ ব্যস্ততায়। তবু, সব ব্যস্ততার জালকে ছিন্ন করে ৭ জুলাই সুদূর ন্যুইয়র্ক থেকেও মনের প্রপেলারে চেপে তিনি অবশ্যই হাজির হবেন মোহনবাগান মাঠে—যেদিন মুখোমুখি হবে লাল-হলুদ ও সবুজ-মেরুণ। সেদিনটা হল কলকাতা ফুটবল লিগ উৎসবের মহাষ্টমী।

গোলটাই আমার কাছে সব নয়—
সন্ধ্যা মুখার্জি

'আমি মোহনবাগান। দাদাদের সবাইকে দেখেছি এই টিমের সাপোর্টার। সেই ইংরেজ আমল থেকে ওরা মোহনবাগানের খেলা দেখে আসছে। ঢাকুরিয়া (এখানেই আমাদের আদি বাড়ি) থেকে বাদাম বা ছোলা চিবোতে চিবোতে এক সময় হাজির হত মাঠে। বাড়িতে কেবল মোহনবাগান নামটাই শুনে এসেছি। তাই ছোট বয়স থেকেই আমিও ঝু'কে পড়লাম মোহনবাগানের দিকে। তবে টিমের চেয়েও আমি বেশী ভালোবাসি ভালো খেলাকে, খেলার স্পিরিটটাকে। এবং সেটাই আমার কাছে আসল ব্যাপার। ধরা যাক—মোহনবাগান জিতল। কিন্তু তার চেয়ে অনেক উদ্দীপ্ত খেলা দেখাল ইস্টবেঙ্গল দল। আমি বিপক্ষের সেই স্পিরিটেড ও প্রাণবন্ত ভূমিকাকেই বেশী অ্যাপ্রিসিয়েট করব। তাই করি। গোলটাই আমার কাছে সব নয়। একজন শিল্পী যখন আর এক শিল্পীর গুণের তারিফ করেন এবং তার স্বীকৃতিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান, তখনই সেই শিল্পীর সত্যিকারের শিল্পবোধের পরিচয় মেলে। এটা সব সময়েই উচিত এবং অবশ্যই খেলার ক্ষেত্রেও। অপরের দক্ষতাকে সব সময় উচিত প্রশংসা করা। ভালো খেলার কদর সর্বত্র। আগে, যখন দু'দল একই মাঠে ছিল, তখন উভয়ের পারস্পারিক লড়াইয়ের পর এই যে একে অপরের টেন্টে যাওয়া, অভিনন্দন জানানো, সহানুভূতি প্রকাশ করা—আমার অন্তরটাও ঠিক যেন তাই। আমার কাছে খেলাটা হল খেলা-ই। খেলা লোকের মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়।'—ধীরে ধীরে শান্তস্বরে কথাগুলো বলে সন্ধ্যা মুখার্জি থামলেন। আমার সামনেই তিনি বসে আছেন। আবেগ দিয়ে কথা বলেন, অমায়িক হাসেন এবং ব্যবহারটা আরও বেশী আন্তরিক। তার পরনে নীল পাড়ের শাড়ি, মাঝে ছোট ছোট ফুলের মত কাজ করা। স্নান হয়ে গেছে। সম্ভবত এইমাত্র পুজো সেরে এলেন। চুলগুলো এলিয়ে দেওয়া। কপালে একটি ছোট্ট লাল টিপ। আমাদের আসরে সন্ধ্যা মুখার্জির স্বামী প্রখ্যাত গীতিকার শ্যামল গুপ্তও আছেন, লোককে হাসাতে যিনি বেশ পারদর্শী।

আমরা চা খেয়েছি কিনা জেনে নিয়ে সন্ধ্যা মুখার্জি আবার শুরু করলেন—'টি ভি দেখতে এমনিতে আমি খুব ভালোবাসি না। তবে সেবার কসমস-মোহনবাগান ম্যাচ, পেলে আসছেন কলকাতায়। আমার ভাইয়ের মেয়ে বলল—পিসি, তুমি পেলের খেলা দেখবে না। জানো, পেলে কে ? অতএব বসতে হল টেলিভিসনের সামনে। আমার প্রথম ফুটবল ম্যাচ দেখা। এবং দারুণ এঞ্জয় করলাম ম্যাচটা। প্র্যাকটিক্যালি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কসমস-মোহনবাগান খেলাটা টি ভি-তে পরে একবার রিপিট হয়েছে। তখনও দেখেছি। এবং আমার খুব ইচ্ছে—টি ভি যেন আবার ম্যাচটা দেখায়। আমি দেখবই—দেখব।'

'বিদেশের গতি, সুব্রত'র অ্যাটাকিং মনোভাব আমার ভালো লাগে। অবশ্য কারোর খেলাই মন্দ লাগে না। নামগুলো আমি খুব গুলিয়ে ফেলি। হ্যাঁ, প্রসূন, সুরজিতদের কথাও মনে পড়ছে। আর দু'জনের কথা মনে আসবেই—শৈলেন মান্না এবং ভেঙ্কটেশ। ভেঙ্কটেশ ক্ল্যাসিকাল ভালোবাসতেন। আমাদের বাড়িতে রোজ-আসর বসত। মাঝে-মধ্যে উনি আসতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতেন মশগুল হয়ে। এমন ক্যারেকটার দেখিনি।

শ্যামল গুপ্ত বললেন, 'বিদেশের তো গতিটা



দারুণ সম্পদ, তাই না !' হ্যাঁ, তাই। ওদের মেয়ে ঝিনুকও কমপ্লিট মোহনবাগান। শ্যামলবাবু মেয়ের কাছে কোন্ দলের সমর্থক জানতে চাইলে ঝিনুক তৎপরতার সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল —মোহনবাগান।

সুব্রত ভট্টাচার্য মাঝে-মধ্যে এখানে আসে। একদিন সে আসার পর ঝিনুক মা'কে বলেছে—মা, তুমি মামাকে বল, যেন ইস্ট-বেঙ্গলকে গোল দেয়।

এবার বড় দলের বেশ কিছু খেলা টেলিভিসনে কিছুক্ষণের জন্য দেখানো হচ্ছে। এবং প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যা মুখার্জি অবসর পেলেই টি ভি-র সামনে গিয়ে বসছেন। আর্জেন্টিনা-হল্যাণ্ড বিশ্বকাপ দেখেছেন। এবং ৭৮-এর ৬ আগস্টও তিনি বসেছিলেন। তিনি আরও যোগ করলেন—'আমি ভাই শান্তিপ্রিয় মানুষ। গতবারে দু'প্রধানের খেলায় বাড়িতে টেলিভিসন ঘিরে সে কি বিরাট উত্তেজনা, চিৎকার—সুব্রত, বল দে। বিদেশ চল্—গোল চাই, ইত্যাদি। এই চেঁচামেচিটা কিন্তু আমার মনে সয় না।' অতঃপর শ্যামল গুপ্ত স্মৃতিরোমন্থন করলেন—শ্যামের বাইসাইকেল কিকে মোহনবাগান জিতেছিল।

সন্ধ্যা মুখার্জি আমাদের রসগোল্লা খাওয়াবার জন্য উঠে গেলেন এবং দ্রুত প্লেট হাতে ফিরে এসে সামনে রেখেই আমার কাছ থেকে ঝালিয়ে নিলেন—৭ জুলাই মোহন-ইস্ট ম্যাচ ডাইরেক্ট টেলিকাস্ট হচ্ছে কিনা। বললাম—হচ্ছে। অতএব এটা ধরে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই—৭ জুলাই চারটের একটু আগে বা পরে কিন্নরকণ্ঠী টেলিভিসনের সামনে বসবেন। অবশ্যই। শত কাজের ঝামেলা এড়িয়েও।

গোলে গোলাক্কার

জয়দেব মুখোপাধ্যায়



চেঁচাস্‌নেকো, বুক্‌নি থামা
করিস্‌নেকো গোল,
ঘাপ্‌টি মেরে বুদ্ধি খেল্‌
তবেই হবে গোল—
জানিস্‌নেকি গোলের জন্যে
বেবাক গণ্ডগোল ?
একটা গোলের পশ্চাতে ফেউ
বাইশটা পাগোল,
গোলটা পেলেই মাথায় তুলে
জুড়বে যে শোরগোল—
গোলটা খেলেই দেবে মুখের
পালটিয়ে ভূগোল।

বাঙালীর আছে—এক রবীন্দ্র-নজরুল, দুই, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল—মানবেন্দ্র মুখার্জি

'এই যাঃ, কার্ডটাই রিনিউ করা হয়নি তো !' কথাটা বলেই বসতে গিয়েও উঠে দাঁড়ালেন ঘন নীল প্যান্ট ও লাল স্ট্রাইপ দেওয়া ঝকঝকে সার্ট পরা মানবেন্দ্র মুখার্জি। চলে গেলেন অন্দরে। মিনিট খানেক বাদেই ফিরে এসে ইস্টবেঙ্গলের মেম্বারশিপ কার্ডটা সামনের টেবিলে ফেললেন। বললেন—আজই রিনিউ করিয়ে নেব (যদিও দিনটি ছিল ২০ মে, রবিবার, তবুও ওদিনও কার্ড রিনিউর বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল)।

ঘরে ঢুকে কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই তার প্রথম কথা, 'দেখো ভাই, পয়সা দিয়ে এত বেশী বাইরের খেলোয়াড় আনার আমি কিন্তু বিরোধী। এতে এখানকার ফুটবলারদের সুযোগ কমে যাচ্ছে। ওরা ডিপ্রাইভড হচ্ছে। না না, আগেও বাইরের ফুটবলার এসেছে—তাই বলে এখনকার ব্যাপারটা আমি সমর্থন করি না।' একটু থেমেই—'নাও, সিগারেট খাও' স্পষ্টতই আবেগ ঝরে পড়ল তার কণ্ঠ থেকে—'ফুটবল ! বাঙালীর তো দুটো জিনিসই রয়েছে। এক—রবীন্দ্র-নজরুল, দুই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ! জানো, এই ফুটবল আমাদের মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়, সজীব করে তোলে এবং কাজকে ভুলিয়ে দেয়। ফুটবলের আলোচনার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে কি ভালোই না লাগে ! এবং তখন মনে পড়ে কত কথা।

সিগারেটের কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া ছাড়িয়ে দিয়ে মানবেন্দ্র মুখার্জি স্মৃতির পথ ধরে হাঁটতে লাগলেন,—'এই সেদিন, পয়লা বৈশাখ, গাড়ি করে একটি ফাংশনে যাবার সময় গোল পার্কের মুখে একজন প্রাচীন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কে মানুষটি ? খুব চেনা চেনা লাগছে। তারপর মনে পড়ে গেল, চমকে উঠলাম—ব্যোমকেশ বসু, পঞ্চাশ দশকের ইস্ট-বেঙ্গল তথা বাংলার দুর্দান্ত ডিফেণ্ডার। আর কোন কথা নয়, গাড়ি থেকে নেমে ওস্তাদ বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। খেলার জন্য আমি ওকে ওস্তাদ বলতাম, ও আমাকে বলত গানের জন্য। ব্যোমকেশ আর আমি অন্তরঙ্গ বন্ধু। গল্প শুরু করে দিলাম। এক ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু কিছুতেই শেষ হতে চায় না সেইসব পুরোনো দিনের কথা। টেন্টে বসে গান করা, সালে-ব্যোমকেশ-মণিলাল ঘটকের সঙ্গে গল্পের তুফান তোলা, সত্যিই ভোলা যায় না দিনগুলো !'

একটা হক কথা বলছি, আগেকার দিনের পরিবেশটা ছিল অনেক ভিন্ন এবং সৌহার্দময়। সেদিন আর নেই। তখন ইস্টবেঙ্গল—মোহন-বাগান টেন্ট ছিল পাশাপাশি। দুই প্রধানের খেলায় পরও একে অপরের টেন্টে গেছি, হাতে হাত মিলিয়েছি, চা খেয়েছি এবং হয়তো কোন মোহনবাগান সমর্থক বলেছে—নিন, মানবদা, একটা পান খান। ভাবি, সেদিন কি আর ফিরে আসবে ?'

'প্রায় দু'যুগ হয়ে গেল আমি ইস্টবেঙ্গলের মেম্বার। আর ইস্টবেঙ্গলের কথা বলতে গিয়ে একজনের নামের উল্লেখ যদি না করি, তবে সে আলোচনা খাপছাড়া হতে বাধ্য। আমি শচীনদেব বর্মণের কথা বলছি। এমন ইস্টবেঙ্গল অনুরাগী আর দু'জন দেখিনি। দেখা হলেই বলতেন, 'মাঠে-ঠাটে যাইস। ওইখানেই জীবন আছে রে! আমার তো আর যাওয়া হয় না।' ইস্টবেঙ্গল—মোহনবাগান খেলায় উনি কখনো আগে মাঠে ঢুকতেন না। লনে অস্থির পায়চারি করতেন। মাঠ থেকে বিরাট চিৎকার উঠলেই উনিও চেঁচাতেন—'ওরে, দিছে রে ! দিছে তারপরই প্রশ্ন করতেন—কে দিল ? ধরা যাক উত্তর হল—ইস্টবেঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে তার গলা ফেটে বেরোত, দিবই তো, দিবই তো ! দেখি, এখন একটু মাঠে যামু।'



'শচীনদা'র একটা উক্তি আমি কোনোদিন ভুলব না। তার আগে বলে নিই—উনি ছেলে রাহুলকে ফুটবলার বানাতে চেয়েছিলেন। একদিন শচীনদা, আমি, ব্যোমকেশ সব বসে আছি। রাহুল পাশের ঘরে মাউথ অরগ্যানে সুর তুলছে। আর থাকতে না পেরে রাগত স্বরে শচীনদা বলে উঠলেন—কি কমু ক, সারাদিন ও কেবল মাউথ অরগ্যান দিয়া ভক্ ভক্ করত্যাছে। কেবল কই—আরে, ফুটবল খ্যাল্। কিন্তু কে শোনে কার কথা।'

সিগারেটটা অ্যাশট্রের গর্ভে গুঁজে দিয়ে মানবেন্দ্র মুখার্জি এবার 'গৃহযুদ্ধের' বর্ণনা শুরু করলেন—'বাড়িতে আমি মেজরিটি। একমাত্র মেয়ে মানসী আমার দলে। তবে ওর মা পাক্কা মোহনবাগানী। মাঝে মাঝে আমাদের দু'জনের সঙ্গে ওর মৃদু সংঘর্ষও হয়। ৭৭-এ কি করল শুনবে। বাইরের যে সব ছেলেমেয়ে এসেছিল, তাদের বেশ খাতির করে জলটল খাইয়ে টেলিভিসনের সামনে বসাল। ও ভেবেছিল, ওরা সব মোহনবাগান'। কিন্তু যেই না মিহির একটা গোল দিল, অমনি সব গোলমাল। একটা প্রচণ্ড উল্লাসে আমার ওয়াইফ একেবারে থ মেরে গেল—ওর সমস্ত আশায় পড়ল ছাই। আর্তনাদ করে উঠল—ওঃ, তাহলে সব ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার, আর আমি এমনভাবে ঠকলাম ! 'সত্যি, এভাবে আমার স্ত্রী আর কোনোদিন ঠকেনি।'



কার্টুন : আলি

'গতবার খুব একটা খেলা দেখতে পারিনি। তবে এবার যাচ্ছি। আমি ইস্টবেঙ্গল, কিন্তু মোহনবাগানের চুনীর তুলনা হয় না, যেমন প্রদীপেরও। মোহনবাগানের এখনকার স্টপার সুব্রত আমাকে মামা বলে ডাকে। ওর মা সম্পর্কে আমার বোন হয়।'

'আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ইস্টবেঙ্গলের পরপর ছয়বার লিগ জয়ের বছরে একদিন গাড়ি করে মেয়েকে নিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ কানে এল কিছু মোহনবাগান সাপোর্টার বলছে—আরে আমরা ক্রমান্বয়ে দশ-বারো বার রেকর্ড করব। তৎক্ষণাৎ আমি গাড়ি থামিয়ে বললাম—কি বললেন—রেকর্ড ! ওঃ, আপনারা বুঝি গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরী করবেন। এই কথায় ওরা তো একেবারে ক্ষেপে লাল।'

শেষ করার আগে গানের কলি নয়, মানবেন্দ্র মুখার্জি একটা কবিতা ট্রাই করেছেন ; কবিতাটা হল :

'ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান।
বাঙালীর ভাগ সমান সমান।
ট্রফি জিতলেই হয় অসমান।
হারলে দুঃখে পাতাল-প্রমাণ।'

মানবেন্দ্রবাবু শুধু লাইন ক'টা বলে দিয়েছেন, আপনারা যে যেভাবে পারবেন সুর করে গেয়ে নেবেন। ➡

'আমরা ঘটি বলেই মোহনবাগানের দিকে ঘেঁষে পড়েছি'

আরতি ভট্টাচার্য



'আমরা ঘটি। আর ঘটি বলেই হয়তো মোহনবাগানের দিকে ঘেঁষে পড়েছি। এবং নামটা ছেলেবেলা থেকেই বাড়িতে শুনে এসেছি। বাবা-কাকারাও এই টিমটির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন পুরোমাত্রায়। এর একটা ঐতিহাসিক ভিত্তিও আছে। সেটা হল ইংরেজদের বিপক্ষে খেলে মোহনবাগান গৌরব পেয়েছে।'

'আমরা তিন বোনই মোহনবাগানের সাপোর্টার। মা অতশত বোঝেন না। আমার হাজব্যাণ্ড কোন দলের, তা আমি ঠিক জানি না। তবে বিরোধী পক্ষের লোক নয় নিশ্চয়ই। আসলে, ও যখন যে টিম ভাল খেলে, তারই সমর্থক। ব্যতিক্রম আমার ভগ্নীপতি স্বপন। ও পুরোপুরি ইস্টবেঙ্গল। এবং ওর দাদাও। অতএব বুঝতেই পারছেন, আমার বোন স্বপ্না এবং আমাদের সঙ্গে ওদের মজার ঝগড়া লেগেই আছে। খেলার ঠিক আগেই স্বপন হয়তো বলল—ইস্টবেঙ্গল জিতবে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রতিবাদে সরব হই—না, মোহন-বাগান। ব্যস্, শুরু হয়ে গেল সংঘর্ষ। যদি ওর টিম হারে, তবে ঘাড় ভেঙ্গে মিষ্টি খাওয়া তো আছেই। যাই বলুন, এই নিয়ে বেশ জমে কিন্তু।'

ইতিমধ্যে আরতির স্বামী অভিনেতা কুনাল এবং ভগ্নীপতি স্বপন আমাদের গল্পে হাজিরা দিয়ে গেছেন। কুনালবাবু স্ত্রী'র বিরুদ্ধতা করেন না। তবে তিন বোনের সম্মিলিত আক্রমণে স্বপনবাবু যখন বেকায়দায় পড়ে যান, তখন কুনাল তাকে উদ্ধারে ব্রতী হন।

কমলা রঙের ব্লাউজ, লাল পেড়ে হলুদ রঙের প্রিণ্টেড শাড়ি, কপালে লাল টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর, কানে দুল—আরতি ভট্টাচার্য বসে আছেন। আরতি সবসময় হাসিখুশী এবং আড্ডায় পারদর্শিনী। অতএব আমাদের আসর জমতে দেরী হল না। আরতি বলছেন '—৭৭ এবং ৭৮, দুবারই মোহনবাগান-ইস্ট-বেঙ্গল ম্যাচের দিন টেলিভিসনের সামনে বসেছি। সেদিন টিভিকে কেন্দ্র করে বাড়ির ডাইনিং টেবলটা দুটো ক্যাম্পে ভাগ হয়ে যায়। হাত চাপড়ানি এবং ঘুঁষিতে ডাইনিং টেবলটাই দুর্দশাগ্রস্ত হয়। গোল হলে সে কি হৈ হৈ ব্যাপার। আমাদের মেয়েদের গলাটা সাধারণত একটু চড়া হয় তো! তাই টিম হেরে গেলেও গলা চড়িয়ে ডিফেণ্ড করি, আর জিতলে তো তুমুল উল্লাস প্রকাশে বাড়ি একেবারে মাথায় তুলি।

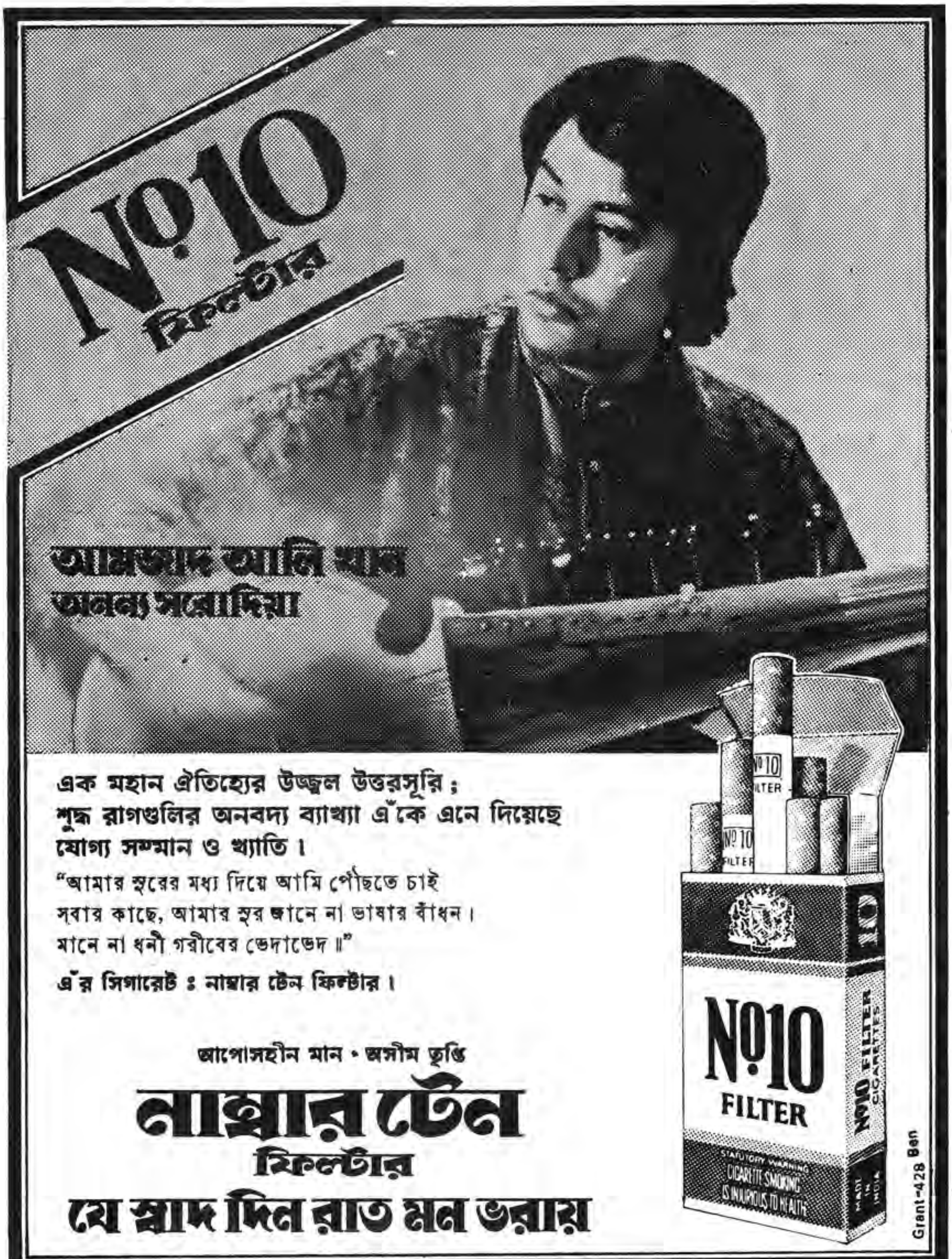
আমরা সব বোনই শ্যাম থাপার খুব ভক্ত। তারপর বিদেশ রয়েছে। আর সুরজিত তো এখন ওই শিবিরের লোক।

স্টুডিও পাড়ায় শমিত ভঞ্জের মত এমন পাঁড় মোহনবাগান সাপোর্টার আমি দুজন দেখিনি। যদি তাঁর টিম হারে, তাহলে উনি হাপুস নয়নে কাঁদেন। যদি জেতে তাহলে তো কথাই নেই, প্রচুর মিষ্টি খাওয়ান। খেলার মাঠ ওকে এমনভাবে টানে যে মাঝে মাঝে স্যুটিংয়েও কামাই দেন। মাঝে সাঝে ওর সঙ্গে চিনুদা'র (চিন্ময় রায়, ইস্টবেঙ্গল) বেশ লাগে। এবং তখন আমি চোখ বুঁজে শমিত ভঞ্জের পক্ষ নিই।

'স্ট্রাইকার' ছবি করতে গিয়ে বেশ কয়েক জন ফুটবলারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বুবুদা'র (শমিত) থ্রু দিয়েই। আমার বোনেরা তো বলেই, আরে ব্বাবা, দিদি তুই খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলেছিস, আলাপ করেছিস।'

আরতি ভট্টাচার্য ৭ জুলাই কিন্তু টিভি-র সামনে বসতে পারছেন না। উনি তখন পাটনায় শ্বশুর বাড়িতে। তবে আমাকে কথা দিয়েছেন সেদিন ওর টিম জিতলে পাটনা থেকে ট্রাঙ্ককলে বা চিঠি লিখে আনন্দ এবং উপচে পড়া খুশীর অভিব্যক্তি 'খেলার আসর'কে জানাবেন। আর যদি হারে? এইরকম আশঙ্কার কথা কারোর মুখ থেকেই আরতি ভট্টাচার্য শুনতে রাজী নন। দেখা যাক, ওর আশা না আশঙ্কা—কোনটা সত্যি হয়।

(সাক্ষাৎকার : হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)



বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ:
সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING:
CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH



গত এক বছরে মহমেডান স্পোর্টিং এবং এবারের লক্ষ্য

শিশির ঘোষ : একাত্তরে শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া সত্তরের দশকে মহমেডানের ঘরে আর কোনও ট্রফি আসেনি। সে বছরও শিল্ড শিকারের দৌড়ে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান হঠাৎ থেমে পড়াতেই মহমেডানের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছিল। আটাত্তরের ফুটবল মরশুম থেকে শুরু করে উনআশির লিগ মরশুমের আগে পর্যন্ত নাগজী ফাইনালে ওঠা ছাড়া সাফল্যের ডঙ্কা বাজাবার দ্বিতীয় কোনও উপলক্ষ নেই।

গত কয়েক বছরের ব্যর্থতায় সদস্যদের মনমরা অবস্থা কাটিয়ে তাদের চাঙা করে তোলার জন্য কর্মকর্তারা তেড়েফু'ড়ে ভাল দল গড়তে মেতে উঠে। যথারীতি, ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান ক্লাবের সেরা খেলোয়াড় ছিনিয়ে নিতে অক্ষম মহমেডান ভিন্ রাজ্যের খেলোয়াড়দের দিকে বেশি নজর দেয়। এর উপরে বাড়তি পাওনা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খারিজ করে দেওয়া কিছু প্রবীণ খেলোয়াড়। আটাত্তরে কেরালা থেকে কোচ হিসাবে নিয়ে আসেন এককালের ডাকসাইটে ফুটবলার রহমানকে। রহমান কলকাতায় এসেই হুঙ্কার দিলেন 'আমি চিংড়ি ইলিশ দুই'ই খাব।' সেই জেহাদ শেষ পর্যন্ত নিছক আস্ফালন প্রমাণিত হল মরশুম শেষে। সবকটা টুর্নামেন্টে মার খেয়ে রহমান শেষ পর্যন্ত সুর পাল্টালেন, 'বুড়ো,খোঁড়া দিয়ে কিস্‌সু হবে না। এরা সব সাজা সোলজার, লড়াই এদের কম্ম নয়।'

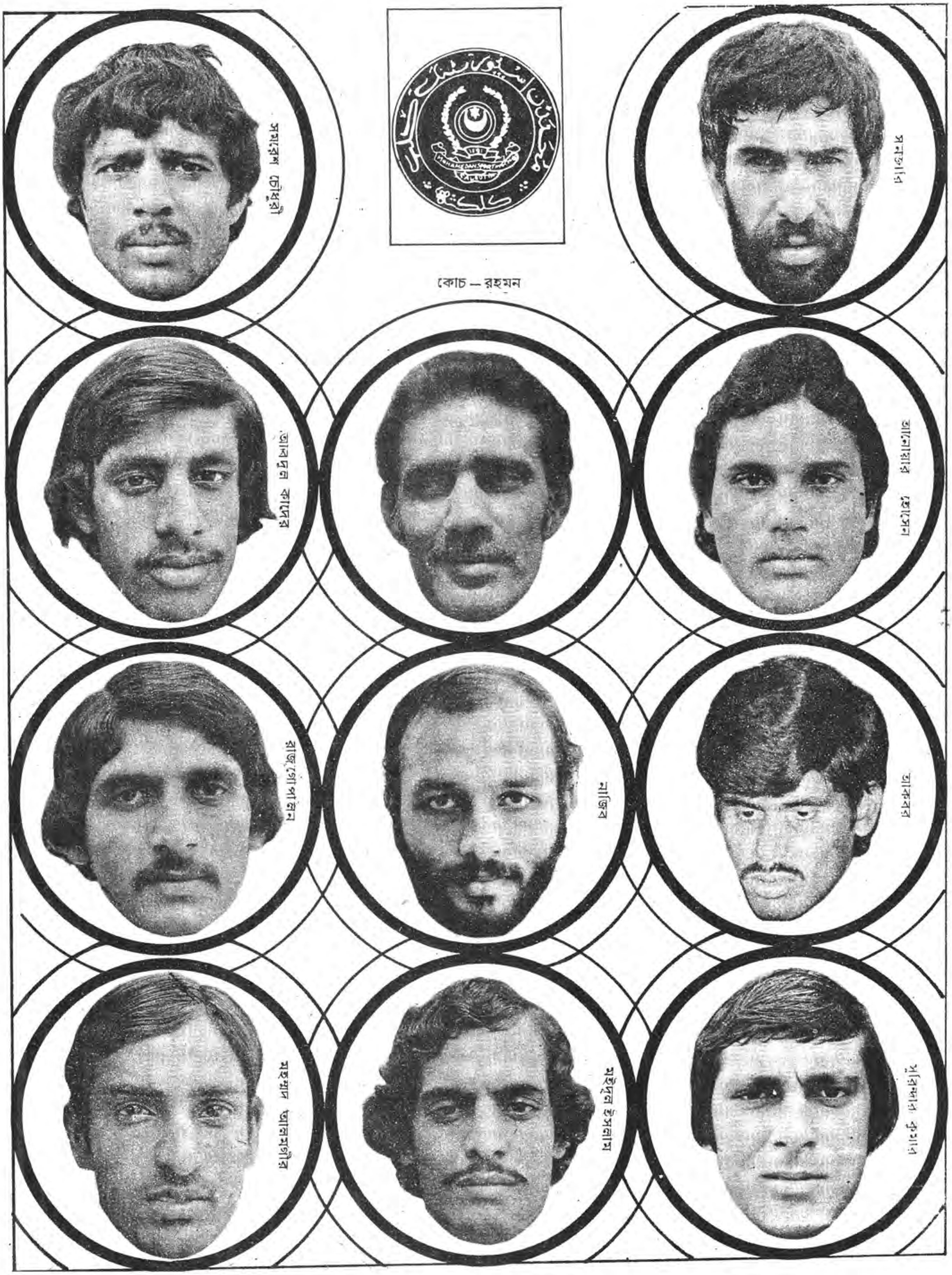
ক্লাবের কর্তা ব্যক্তিরাও রহমানের সঙ্গে একমত হলেন। সেই সঙ্গে তারা এটাও ভাবলেন, ইলেকশন জিততে গেলে সদস্যদের নতুন কোনও চমক দিতে হবে। কারণ আটাত্তরে ক্লাবের ফল মোটেই ভাল নয়। লিগে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল (২—০) এবং মোহনবাগানের (২—০ গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মাঠ ছেড়ে চলে যায়) কাছে মার খাওয়ায় এবং শিল্ডে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম খেলাতেই হেরে যাওয়ায় (৪—০ গোলে আরারাতের কাছে) সদস্য এবং সমর্থকরা বেশ ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তারপর একে একে রোভার্স (কোঃ ফাইনাল), ফেডারেশন (কোঃ ফাইনাল), বরদলুই (কোঃ ফাইনাল) ট্রফিতেও শোচনীয় পরাজয় সকলের মনোবল একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। অন্যান্য টুর্নামেন্টে ব্যর্থতার জন্য গত পাঁচ বছর ডুরাণ্ডে যোগ দেবার আমন্ত্রণ থেকেও বঞ্চিত।

সেই হতাশা ভেঙ্গে সকলকে চাঙা করে তোলার প্রথম চমক দিলেন কোচ রহমান নিজেই। আটাত্তরের জানুয়ারিতে কলকাতায় সন্তোষ ট্রফি চলাকালেই রহমান কেরালার চার স্টার ফুটবলার পায়াস, নাজিব, প্রেমনাথ এবং দীনকরকে মহমেডান তাঁবুতে এনে তুললেন। ক্লাবের অপর দুই কর্মকর্তা ডাঃ রফিক আমেদ এবং হায়দর আলি নক্কর পাঞ্জাব ফুটবলারদের ডেরায় ঢুকে পড়ে হরজিন্দার এবং গুরদেবের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। হরজিন্দার-গুরদেব আবার মনজিতের কথা পাড়লেন। প্রাথমিক চুক্তি সারা হল, তারা কিছু টাকাও নিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পায়াস গেল মোহনবাগানে এবং গুরদেব-হরজিন্দার-মনজিত ইস্টবেঙ্গলে। সেই বহু আলোচিত এবং লিখিত রহস্যের কাহিনী নতুন করে লেখা নিরর্থক। কিছু তরুণ খেলোয়াড় রিক্রুট করে কর্মকর্তারা তারুণ্য এবং অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের মিলিত শক্তির সমতা আনতে চেষ্টা করলেন।

ইতিমধ্যে, বার্ষিক নির্বাচন হয়ে গেল। সামান্য দু একটি পরিবর্তন ছাড়া মোটামুটি ক্ষমতাসীন দলই আবার ক্ষমতায় ফিরে এলেন। গতবারের দাউদকে সরিয়ে মাসুদকে ফুটবল সেক্রেটারি করা হল। মাসুদ অতীতেও মহমেডানের ফুটবল সেক্রেটারি ছিলেন। আকবরকে কেন্দ্র করে মোহনবাগানের সঙ্গে হাবিবের বনিবনা না হওয়ায় এবং পিন্টু চৌধুরির সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার সুযোগ নিলেন ফুটবল সেক্রেটারি মাসুদ এবং এককালে হাবিবের একান্ত সহচর জেনারেল সেক্রেটারি ইশরার আমেদ। কোচ রহমান বনাম ক্যাপ্টেন হাবিব এবং ফুটবল সেক্রেটারি মাসুদের মন কষাকষির তিক্ত ঘটনার উল্লেখ তার নিষ্প্রয়োজন।

সর্বভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে মহমেডানের হয়ে গুছিয়ে বলা বা করার লোক নেই। সেরকম পজিশনে কোনও কর্মকর্তাকে পৌঁছতে দেওয়া হয় না। জনপ্রিয়তার দৌড়ে কেউ সামান্য এগিয়ে গেলে অন্যেরা তাকে টেনে নামিয়ে আনার জন্য কোমর বাঁধে। কোনও একজনের প্রাধান্য বা নেতৃত্ব এই ক্লাবে স্বীকৃত নয়। এখানে সবাই রাজা। নিয়ম শৃঙ্খলার রাশ টেনে চলার কেউ নেই। যার ফলে প্রবীন এবং স্টার ফুটবলাররা যে যার নিজের মর্জি মাফিক চলে। কয়েকদিন খেলা না থাকলে, ভিন্ রাজ্যের ফুটবলাররা যে যার দেশে ফিরে যায় এবং খেলার দিন অথবা আগের দিন রাত্রে কলকাতা ফেরে। একজন কর্মকর্তা বেশ কিছুদিন আগে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'আমাদের প্লেয়াররা কেউ সিরিয়াস নয়। অবশ্য আমরাই কমজোরী। আমরাই তাদের একাত্ম করতে বা তাদের মধ্যে সংহতি গড়ে তুলতে পারিনি। গতবছর রোভার্স ম্যাচে আউট স্টেশন প্লেয়াররা খেলার দিন ফেরাতে ফেডারেশন কাপের খেলার বেশ কয়েকদিন আগে ফিরতে বলা হয়েছিল। কিন্তু কেউ সে কথার তোয়াক্কা রাখেনি। এই কারণে কোনও টুর্নামেন্টের আগে আমাদের প্লেয়াররা ভালমত প্র্যাকটিশ পায় না।'

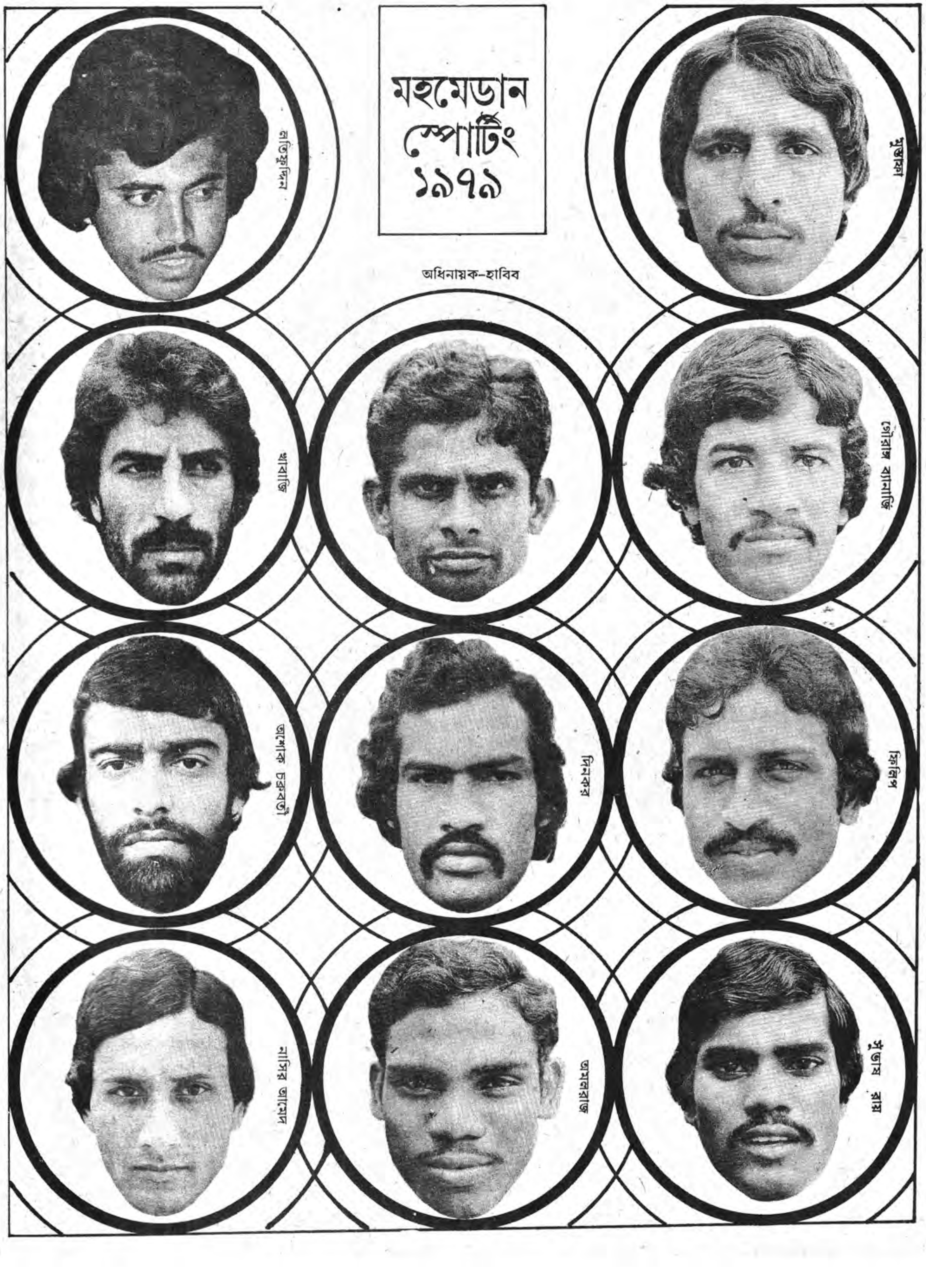
অবশ্য একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবছরও ঘটছে। কোচ রহমানের আক্ষেপ কর্মকর্তাদের কাছে বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনও ফল হয়নি। যে যার নিজের মন মত বলা এবং



কোচ — রহমন

মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৭৯

অধিনায়ক-হাবিব



প্রেসের কাছে ইচ্ছামত বক্তব্য রাখার ফলে দলগত সংহতি এবছরও গড়ে ওঠেনি। এক ছাদের তলায় বাস করলেও অনেকের মধ্যে বাক্যালাপ নেই। এই অশান্ত পরিবেশে স্বস্তি ফিরিয়ে আনার উদ্যোগও কারও নেই। বহুদিন ভাল ট্রফি না পাওয়ায় সদস্যরা মুষড়ে পড়েছেন। প্রতি বছর পঁচাত্তর টাকা চাঁদার জায়গায় আরও কিছু বেশি দিতে সদস্যরা পিছপা নয় কিন্তু তার বিনিময়ে চান মাথা তুলে গর্ব করার কিছু উপলক্ষ্য। এবার লিগে প্রথম খেলাতেই পয়েণ্ট হারিয়ে দলের খেলোয়াড়রা সদস্যদের আবার হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছে। এখন তাদের একমাত্র আশা যদি মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সমান তালে তাল ঠুকে চরম দুটি খেলায় তাদের ঘায়েল করা যায়।

সাড়ে তিন হাজার সদস্য এবং বেশ কিছু শুভানুধ্যায়ীর বিশেষ দান মিলিয়ে ফুটবলের জন্য ফি-বছর খরচ হয় লাখ পাঁচেক টাকা। কিন্তু একটিও ট্রফি ঘরে ওঠে না। বছরের পর বছর ব্যর্থতার আঘাতে সদস্যদের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী কিছু পৃষ্ঠপোষক এখন ক্লাব সম্বন্ধে কিছুটা উদাসীন। এই হতাশা দূর করে সকলকে সঞ্জীবিত করতে পারে মাত্র কয়েকটি ট্রফি। দেখা যাক, এবছর হাবিব-সমরেশ-নাজিব-লতিফুদ্দিন-নাসিররা হতাশার গহ্বর থেকে বহু প্রতীক্ষিত সেই সুসময়ে মহমেডানকে উতরে দিতে পারে কিনা। ⚽



গত বছর (৭৮) ফুটবল লিগে মোহনবাগান ঃ মহমেডানের খেলায়

ওলিম্পিকের গপ্পো

লেখা : অশোক চট্টোপাধ্যায় ● রেখা : জি. সান্তা



(চলবে



Duckback
বর্ষাতির সেরা
গুণেমানে অনুপম
দেখাতেও সুশোভন।
বিভিন্ন সাইজে ও
রঙে পাওয়া যায়
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ
naa.BW-7834



প্রতিটি ফোঁটাই পুষ্টি যোগায়!
কেয়ো-কার্পিনের প্রতি ফোঁটাই চুলের
পুষ্টি যোগায়···চুলকে সজীব রাখে।
তাইতো আমি রোজ কেয়ো-কার্পিন
মাখি। আর কেয়ো-কার্পিনের
মনোরম গন্ধের মিষ্টি আমেজ
সারাদিন আমায় প্রফুল্ল রাখে।
কেয়ো-কার্পিন
কেশ তেল
Dey's
দে'জ মেডিকেলের তৈরী
A HAIR OIL OF DISTINCTION

এবার জুনিয়র ফুটবলারদের কে কে নজর কেড়েছে

সন্দীপ দত্ত : এবছর কলকাতা লিগ ফুটবল শুরু হয়েছে দেড় মাস আগে। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন উঠতি খেলোয়াড়ের দেখা মেলা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার বলা যায় বিশেষত দৈনিক তাপমাত্রা ১০৮ থেকে ১০৯ ডিগ্রি ফারেনহাইটের সঙ্গে আগুনের হলকার মত গরম হাওয়ার মধ্যে কেউই স্বাভাবিক ফুটবল খেলতে পারেনি। তবে আশার কথা এর মধ্যেই বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড় ফুটবল সমঝদারীদের নজর কেড়েছে। এরা প্রত্যেকেই বয়সে নবীন। সুতরাং যত প্রতিশ্রুতিই থাক এরা সকলেই ভবিষ্যতে বড় খেলোয়াড় হয়ে ফুটবল মক্কার খেলা-পাগল দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে এখন থেকেই হলফ করে বলা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা ভাল ফুটবলার হতে গেলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভাগ্যের সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয় তার ওপর বড় ক্লাবে খেলার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিকতা গড়ে


বিশ্বজিত ভট্টাচার্য

নিতে হলে যে পরিমাণ সুযোগ সুবিধা দরকার এদের সকলেই যে তা পাবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

এবছর যে কয়েকজন নতুন মুখকে দেখে ফুটবল-প্রেমীরা ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধছেন তাদের মধ্যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশী আলোচিত নাম এরিয়ানের স্ট্রাইকার বিশ্বজিত ভট্টাচার্য। গত দু'বছর ধরেই বিশ্বজিত ভাল খেলছে। কিন্তু এবছর অনেক পরিণত। এই লেখা তৈরির সময় পর্যন্ত ছ'টি গোল করে বিশ্বজিত লিগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। এযাবৎ প্রায় সবকটি ম্যাচেই সতীর্থ খেলোয়াড়দের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে এবং সময় প্রয়োজনে জায়গা বদল করে খেলে বিশ্বজিত বিপক্ষ গোলে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। খুব অল্প জায়গার মধ্যে দু'পায়েই জোরালো সট নিতে পারে। এছাড়া হেডেও ভাল দখল আছে।

কালিঘাটের ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটের এই ছেলেটি খুব ছোটবেলা থেকেই কালিঘাট পার্কে পাড়ার অন্যদের সঙ্গে বল নিয়ে দাপাদাপি করত। একটু বড় হয়েই ফুটবলের প্রথম পাঠ নিতে যায় দক্ষিণ কলকাতার লেক মাঠের সুপরিচিত কারিগর খোকন বসু মল্লিকের কাছে। প্রথমে স্টপার পজিসানে খেলত। পরে দীক্ষা গুরুর কথা অনুযায়ী স্ট্রাইকারের জায়গায় চলে আসে।

প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলে ১৯৭৪ সালে তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনের হয়ে আন্তঃজেলা স্কুল ফুটবলে। নির্বাচকদের খুশী করে অল ইণ্ডিয়া স্কুল ফুটবলে আগ্রায় অনুষ্ঠিত জয়ী বাংলা দলে চান্স পেয়ে যায়। ফাইনালে মণিপুরের বিরুদ্ধে একটি গোলও পায়। পরের বছর বিশ্বজিতের অধিনায়কত্বে ফাই-নালে দিল্লিকে ২-০ হারিয়ে বাংলা পরপর চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়। সে বছর কোচ 'খোকনদা'র সহায়তায় স্পোর্টিং ইউনিয়নে যোগ দিয়ে লিগে কয়েকটি ম্যাচ খেলেছিল। লিগের মাঝামাঝি সময়ে তুরস্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্কুল ফুটবলে যোগদানের প্রস্তুতি হিসেবে পাতিয়ালা ট্রায়াল ক্যাম্পে ডাক পায়। নির্বাচিত ১৭ জন সদস্যের মধ্যে বিশ্বজিত সহ বাংলার মোট ১৩ জন দলে ঠাঁই পেয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভারত দল পাঠায়নি। '৭৬ সালে আগরপাড়া নেতাজী শিক্ষায়তনে ভর্তি হয়। সে বছর আগরপাড়ার এই স্কুলটি বাংলারই অপর শক্তিশালী দল পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশনকে ৩-০ হারিয়ে প্রথমবার সুব্রত কাপ জয় করে। তিনটি গোলের দুটি ছিল বিশ্বজিতের। সে বছর কাশ্মীরে জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে রানার্স বাংলা দলেও বিশ্বজিত ছিল। অবশ্য পরের বছর কটক থেকে বিশ্বজিতের ক্যাপ্টেন্সিপে বাংলা বি. সি রায় ট্রফি নিয়ে ঘরে ফেরে ফাইনালে উদ্যোক্তা ওড়িশাকে ১-০ হারিয়ে। কটক থেকে ফিরেই পাতি-য়ালায় এশীয় যুব ফুটবলের প্রস্তুতি শিবিরে ডাক পায়। এবং নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে বাঙ্গালোরের ফাইনাল ক্যাম্প ঘুরে ভারতের সহ-অধিনায়ক হিসেবে ঢাকা গিয়ে-ছিল '৭৮ সালে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একটি সুন্দর গোলও লিখিয়েছে নিজের নামের পাশে। গত দু'বছরে ময়দানের অন্যতম ফাইটিং সাইড খিদিরপুরের আক্রমণভাগের নিয়মিত যোদ্ধা ছিল। এবছর সাংহাইয়ে



বিধিসম্মত সতর্কীকরণ: সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING:- CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

SAA/FD/16B2

[illegible] এশীয় যুব ফুটবলের প্রস্তুতি শিবিরে [illegible] ডাকও ইতিমধ্যেই হাতে পেয়ে গেছে। ১৯ [illegible]র বয়সী এই ছেলেটির বাড়িতে সব[illegible] খেলাধূলার চর্চা ছিল। তাই উৎ[illegible] অভাব নেই। লম্বা ছিপছিপে চে[illegible] বিশ্বজিত এবছর নেতাজীনগর ক[illegible]কে বাণিজ্য বিভাগে পার্ট ওয়ান [illegible]দিয়েছে। অবসর সময়ের একমাত্র স[illegible]ও।

★

[illegible] গোলকিপার হিসেবে খিদিরপুরের [illegible] দিলীপ পাল ইতিমধ্যেই অনেকের নজ[illegible]ড়েছে। একজন ভাল গোলরক্ষকের প্র[illegible] গুণগুলি প্রায় সবই ওর মধ্যে



দিলীপ পাল

বর্তমান। দিলীপের সবচেয়ে বড় সুবিধে ওর ৫ ফু[illegible] ইঞ্চি দীর্ঘ চেহারা। শরীরের এই [illegible] সুবিধায় দিলীপ অনায়াসেই বিপক্ষ [illegible]লোয়াড়ের মাথা থেকে বল তুলে নিতে [illegible]। গড়িয়ে আসা সটগুলিও কর্ণারে [illegible] ভালভাবে আটকাতে পারে। তবে [illegible] মানসিক স্থৈর্য কিছুটা কমজোরী। যার জ[illegible] মাঝে মধ্যে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গোল [illegible]য়। এ ধরনের দুর্বলতা দিলীপ খুব [illegible] কাটিয়ে উঠতে পারবে বলেই সকলের [illegible]।

[illegible]ব্যারাকপুরের মোহনপুর স্পোর্টিং ক্লাবের [illegible] সিংহের কাছেই ফুটবল শুরু। ৭৪-এ [illegible]পাড়া নেতাজী শিক্ষায়তনের গোলরক্ষক হিসেবে আন্তঃজেলা স্কুলে খেলার সময় [illegible] নির্বাচকদের মনে ধরে। ফলস্বরূপ [illegible] অল ইণ্ডিয়া স্কুল ফুটবলে জয়ী [illegible] দলের গোলরক্ষকের দায়িত্ব দিলী[illegible] বর্তায়। সেবছরই ভারতীয় স্কুল [illegible] বিশ্ব স্কুল ফুটবলের আসরে যাওয়ার [illegible] পেলেও শেষ মুহূর্তে ভারতীয় দলের [illegible] বাতিল হয়ে যায়। পরের বছরই সুশীল সিংহের হাত ধরে ঘেরা মাঠের ছাড়পত্র মিলে যায় ভ্রাতৃসংঘের গোল আগলাবার দায়িত্ব পেয়ে। পরপর দু'বছর ভ্রাতৃতে কাটিয়ে '৭৭-এ বাটা ঘুরে গতবছর খিদিরপুর ক্লাবের প্রাণপুরুষ ভূতনাথ বিশ্বাসের ডাকে খিদিরপুরে চলে আসে। সেবার কটকে জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে ট্রফি পাওয়া বাংলা দলের গোলরক্ষক ছিল দিলীপ। সেখানে দিলীপের গোলকিপিংয়ে নির্বাচকদের খুশী করে খুব সহজেই দিলীপ ঢাকায় এশীয় যুব ফুটবলে যোগদানকারী ভারতীয় দলে নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে এক নম্বর গোলরক্ষক নির্বাচিত হয়। ঢাকায় শক্তিশালী উত্তর কোরিয়ার খেলোয়াড়রা ছাড়া আর কেউ ভারতীয় গোলে বল পাঠাতে পারেনি। সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিতব্য এশীয় যুব ফুটবলের ট্রায়ালে যাওয়ার জন্য চিঠি পেয়েছে।

১৯ বছর বয়সী ছিপছিপে শ্যামলা চেহারার দিলীপ এবছর নেতাজীনগর কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়েছে। হাসিখুশী ও মিশুকে প্রকৃতির দিলীপকে বাড়ির সকলেই দারুণ উৎসাহ দেয়। যদিও আগে কেউ বিশেষ খেলাধূলা করেনি। হবি, গান শোনা ও খেলাধূলা বিষয়ক কাগজ পড়া। ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক তরুণ বসু ওর প্রিয় খেলোয়াড়।

(চলবে)

ফুর্‌রু-ফুর্‌

রক্তিম ইসলাম



গড়ের মাঠে বাজলো বাঁশী
তাক ধিনা-ধিন আই এফ এ
বাচ্চা-বুড়ো সবাই ছোটে
কে আর কাকে ঠেকায়রে!

দুই বাজলে অফিস ফাঁকা
স্কুল পালিয়ে ছেলের দল
রেডিও ঘিরে প্রতি ঘরে
সবাই যেন খেলছে বল।

হার-জিত সব হয়ে গেল
ফুর্‌রু-ফুর্‌ বাজলো বেশ
সমর্থকে পাগল হ'ল
এ এক ভাই আজব দেশ।

খড়্গপুরে ফুটবল লিগ

খড়্গপুরের সংবাদদাতা : রেলশহর খড়্গপুর মেতে উঠেছে আসন্ন আন্তঃক্লাব লিগ খেলার আয়োজনে। মাসখানেক আগে 'সেরা স্টেডিয়ামে' হয়েছিল জি এম ফুটবল টুর্নামেণ্ট, ফলে সাব-ডিভিসনাল্ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে তাদের খেলা পিছিয়ে দিতে হয়। অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জানান, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাদের গত বছরের লিগ শেষ করতে হয়েছে। গত বছর ফার্স্ট ডিভিসনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল 'সাউথ ইন্দা ইয়ুথ ক্লাব' এবং রার্নাস ঘোষণা করা হয়নি। সেকেণ্ড ডিভিসনে চ্যাম্পিয়ন 'চয়নিকা স্পোর্টিং ক্লাব' এবং রার্নাস 'রাও ব্রাদার্স ক্লাব।' ওরা এবার ফার্স্ট ডিভিসনে খেলছে।

সম্পাদক আরও জানান এবার খড়্গপুর লিগ বেশ জম-জমাট হবে। কলকাতার কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় এবার কয়েকটি দলের হয়ে খেলছেন। খড়্গপুর-এর অনেক ছেলে কলকাতায় খেলেন। এবার ফার্স্ট ডিভিসনে ১৩টি দল এবং সেকেণ্ড ডিভিসনে ১৬টি দল অংশগ্রহণ করেছে। ফার্স্ট ডিভিসনে শক্তিশালী দল হিসাবে দেখা যাবে, সাউথ ইন্দা, ট্রাফিক রিক্রিয়েশন ক্লাব, ডেভলপমেণ্ট ক্লাব, তরুণ সংঘ, বেঙ্গলি ক্লাব ও শক্তি মন্দির। সেকেণ্ড ডিভিসনে উল্লেখযোগ্য দলগুলির মধ্যে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, সোনালী শিবির, প্রান্তিক, বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব। এবার ৫টি নতুন দল দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলছে।

লিগে কলকাতার খ্যাতনামা খেলোয়াড় অশোক চন্দ, কিশোর দাস, সুনীতি গুড়িয়া, স্বপন চক্রবর্তী এবং গৌতম সাহা ডেভলপমেণ্ট স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন।

উল্লেখযোগ্য দল বদলের মধ্যে বেঙ্গলি ক্লাবের প্রণব হালদার শক্তি মন্দিরে, এ আচার্য ট্রাফিক রিক্রিয়েশন ক্লাবে। ডেভলপমেণ্ট ক্লাবের দীপ্তেন ভৌমিক বেঙ্গলি ক্লাবে, টি রাজ ইস্ট ক্লাবে। বেঙ্গলি ক্লাবের তপন বেরা মালঞ্চ তরুণ সংঘে, নব ভারত থেকে তরুণ গিরি ও ডেভলপমেণ্টে-এর অনুপ ভট্টাচার্য চয়নিকায়। ইন্দারের নিটি ভট্টাচার্য বেঙ্গলি ক্লাবে।

ফার্স্ট ও সেকেণ্ড ডিভিসনে ২টি করে গ্রুপ। তারপর সুপার লিগ।

১৮ জুনে এ বছরের প্রথম ডিভিসনের লিগ খেলার উদ্বোধন করলেন এস ই রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ নৃপেন চৌধুরী।



মুদ্রক ও প্রকাশক : অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিণ্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং হত্যাাদ প্রকাশনী ৪৭ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত

জয় ফুটবল জয়

আলেখ্য : ভাল্টার নয়গেবাউয়ার (তের
অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত



Registration No. 30198/77 KHELAR AASAR 29th June/6th July 1979 WB/CC—334/77 Rs. 3.00

